প্রত্যয়

Pratyay

प्रत्यय

State Council of Educational Research & Training (WB)
25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700 019

Volume -II **JANUARY, 2007** **No. -1**

State Council of Educational Research & Training (WB)

25/3, Ballygunge Circular Road,
Kolkata-700 019

A journal published by Scert (WB) for National Population Education Project of NCERT

Editor : Dr. Rathindranath De
Director, SCERT (WB)

Assistant Editors : Sri Hirak Kumar Barik
Dr. Urmi Chakraborty
Smt. Anasuya Ray Chaudhuri
Smt. Sridebi Dasgupta

Pratyay

Cover Design : Smt. Sridebi Dasgupta

Published by : Director
State Council of Educational Research & Training (WB
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700 019

Printed by : Silpabrata Printing Press Ltd.
25 & 27 Canal South Road
Kolkata - 700 015

CONTENTS

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

1.	Prof. Jyotiprokash Ghosh	Ex-President, West Bengal Board of Primary Education
2.	Prof. Prabuddhanath Roy	Ex-Pro-Vice Chancellor, Calcutta University
3.	Ms. P. Chandrika Rani	Assistant Director, Vocational Rahabilitation Centre, Kolkata
4.	Ms. Sukanya Gupta	Programme Officer, Initiative for Social Action and Change, SWAYAM, Kolkata

EDITORIAL

The present issue of 'Pratyay' is the third one published since October 2005 under the aegis of the National Population Education Project being carried out at the State Council of Educational Research & Training (West Bengal). 'Pratyay' is an effort to disseminate the ideas propounded in Population Education.

The United Nations Development Programme has declared the current decade (2005-2015) as the 'Decade of Sustainable Development' and there is considerable demand from a section of people for inclusion of all developmental issues in school curriculum. Another group, armed with the recommendations of several committees and commissions, is in favour of reducing the curricular load of school children. Population Education in its present form aims at bridging the gap between the two lobbies by promoting learning of the developmental issues without increasing the curricular burden. The main thrust of Population Education is on the development of life skills among adolescents through cocurricular activities. 'Pratyay' being the mirror of the Population Education Project, reflects the same philosophy and presents discussions on such issues.

This issue of 'Pratyay' contains write-ups on sound pollution, sustainable development, vocational rehabilitation, and attitude of adolescents towards domestic violence and gender issues.

Prof. Jyoti Prakash Ghosh, former President, West Bengal Board of Primary Education, in his essay on 'Sound Pollution' defines the term, unit of measurement, enumerates the different sources of sound pollution, warns us of the harmful effects of sound pollution on public health and enlightens the readers on the ways to counter the ill-effects.

The write-up titled 'Population Growth and Sustainable Development of the Earth' by Prof. Prabuddha Nath Roy, former pro- Vice-Chancellor, University of Calcutta, highlights the relationship between utilisation of natural resources and sustainable development. Prof. Roy has laid stress on the importance of maintaining ecological balance while meeting the challenges of a rapidly growing population.

Ms. P. Chandrika Rani, Assistant Director, Vocational Rehabilitation Centre, Kolkata, in her essay 'Vocational Evaluation – a Key Factor in Rehabilitation' familiarizes the readers with the vocational evaluation of persons afflicted with disabilities and the process involved, like, work as a means of evaluation, work sample as a method of work evaluation, preparation and construction of a work sample, development and utility of work sample and tentative work samples.

'Young Minds Speak – A Study on Attitude of School Children on Gender Inequality and Violence against Women' is the outcome of a study conducted by Sukanya Gupta, Programme Officer, Initiative for Social Action and Change, SWAYAM, Kolkata on 3237 school children between 12 to 19 years of age from English medium and vernacular medium schools in Kolkata. The findings of the study and recommendations arising thereof have been presented in the report.

SCERT (WB) organised a two day seminar on 11th and 12th July 2006 in order to observe World Population Day. The seminar was inaugurated by Shri Partha Dey, Hon'ble MIC, School Education, Government of West Bengal. Hon'ble MIC stated that awareness about considering population as human resource at all levels is very important. For this purpose it is necessary to impart proper education and to conduct research in this area. He was of the opinion that school children should be made aware of the importance of nutrition in everyone's life and also of social evils like dowry system. The report of the seminar was published in 'Shikshadarpan', the educational journal of School Education Department, GoWB and has been reprinted here with the permission of the editor.

With the aim of showing respect to its readers, a section of 'Pratyay' has been dedicated to their views and suggestions. The journal also contains the 'Newsletter' section that showcases the different activities taken up by SCERT under NPEP, SSA-DPEP, NCF'05, etc. during the year 2006-07.

It should be mentioned here that the view expressed by the writers are exclusively theirs and SCERT (WB) is in no way accountable for them.

We hope that this issue of 'Pratyay' will be appreciated by its readers. Readers are requested to come forth with their views about this issue. Write-ups are also invited from readers who are interested in the themes related to Population Education. This would help us to enrich 'Pratyay'.

Dated: Kolkata, January the 15th, 2007

Dr. Rathindranath De
Director, SCERT (WB)

শব্দদূষণ ঃ আধুনিক সভ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ

জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ

শব্দ ঃ সম্পদ না আপদ ?

শব্দ আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম। শব্দ ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না, আমাদের পরস্পর ভাব বিনিময়ের ভাষা যুগিয়েছে শব্দই। পাখির কলকাকলি, সেতারের সুরেলা ধ্বনি, সুন্দর সঙ্গীত, সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি — এসব আমাদের শ্রবণ মনকে তৃপ্তি দেয়। একটা নিঃশব্দ ঘরে দিনের পর দিন যদি কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা যায় তবে তো ওই ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন। কাজেই শব্দ পরিবেশের এক অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু, এই শব্দই যদি প্রবল হয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়, যদি বেসুরো উৎকট আওয়াজের সৃষ্টি করে তবে সেই শব্দ আমাদের বিরক্তি উদ্রেক করে, অনেক সময় অস্থির করে দেয়, কান প্রাণকে ভেদ করে সেই শব্দ হয়ে ওঠে শব্দ যন্ত্রণা বা কোলাহল (Noise)।

বলা যেতে পারে শব্দ যন্ত্রণা হল অনভিপ্রেত স্থানে ও সময়ে অনভিপ্রেত বা অনাকাঙ্খিত শব্দ। কোথাও একটানা হাতুড়ি মারার শব্দ, রাস্তা দিয়ে ভারী ট্রাক চলে যাচ্ছে সেই আওয়াজ, মোটর গাড়ির এয়ার হর্নের একটানা কর্কশ আওয়াজ, একটানা জলের পাম্প বা জেনারেটর চালানোর শব্দ, জোরালো শব্দের বাজি পটকা ফাটানোর আওয়াজ, একবারে কানের কাছে মাইক্রোফোন, টিভি, রেডিও, টেপরেকর্ডারের জোরালো আওয়াজ, একটানা গাড়ি চালানো এসব কিছুই শব্দযন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে।

অবশ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজনের কাছে যে শব্দ অনভিপ্রেত, অপর কোনো ব্যক্তির কাছে সেই শব্দই মধুর এবং অভিপ্রেত হতে পারে। আবার, একই উৎসের শব্দ একটি প্রাবল্যমাত্রায় অনাকাঙ্খিত হলেও অপর প্রাবল্যমাত্রায় কাঙ্খিত হতে পারে, মধুর ও সুরেলা মনে হতে পারে। একইভাবে বিশেষ স্থান ও বিশেষ সময়ে যে শব্দ অনভিপ্রেত, সেই শব্দই অপর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ও বিশেষ সময়ে মধুর আওয়াজবর্ষী মনে হতে পারে (যেমন, শ্রাদ্ধবাসরে প্রেমের গান বা বিবাহবাসরে বিষাদ সঙ্গীত) অর্থাৎ, শব্দ মধুর অথবা বিধুর শব্দ যন্ত্রণা সে বিষয়টি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র সাপেক্ষে নির্ভরশীল। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বেশ কিছু শব্দ ব্যক্তি নির্বিশেষ সকলেরই শরীর বা মনের ওপর কম-বেশি পরিমাণে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে — বলা চলে এই ধরনের শব্দ শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

শব্দদূষণ ঃ

শব্দদূষণের সাধারণভাবে একটি সরল সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে ঃ

প্রাবল্যমাত্রার একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বেসুরো আওয়াজের (কর্কশ আওয়াজের) কোনো শব্দ (বা কোলাহল) যদি একটানা একটা সময়কাল ধরে ধ্বনিত হয়ে জনস্বার্থের (বা অন্যতর) কম-বেশি ক্ষতি সাধন করে, তবে তেমনতর ঘটনাকে শব্দদূষণ বলে।

শব্দদূষণের মাত্রা তাহলে মূলত নির্ভর করে দূষণ সৃষ্টিকারী শব্দের প্রাবল্যমাত্রা, ওই শব্দ ধ্বনিত হওয়ার সময়সীমা এবং শব্দে সুরেলা অথবা বেসুরো এই বিষয়গুলির সমন্বিত প্রভাবের ওপর, যদিও প্রথম কারণটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শব্দদূষণকে শব্দ সম্পদের অপচয় অথবা অপপ্রয়োগ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

শব্দ প্রাবল্য মাত্রার পরিমাপের একক ঃ

শব্দের প্রাবল্যমাত্রার পরিমাপ করা হয় বেল বা ডেসিবেল এককে (1 বেল = 10 ডেসিবেল)। দূরভাষের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের নাম অনুসারেই এই একক। সরলীকৃতভাবে এই একক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া

যেতে পারে কয়েকটি তথ্য থেকে (সঠিকতর ধারণা পেতে বেল বা ডেসিবেলের গাণিতিক সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন) ঃ সম্পূর্ণ সুস্থ কানে শ্রবণযোগ্য ন্যূনতম আওয়াজের শব্দের প্রাবল্য মাত্রা হল 0 ডেসিবেল, গাছের পাতার মৃদু মর্মর ধ্বনির প্রাবল্যমাত্রা 1 বেল বা 10 ডেসিবেল, বেতার স্টুডিওর অভ্যন্তর বা গির্জার অভ্যন্তর 20 ডেসিবেল, পাঠাগারের অভ্যন্তরের শব্দ 30-40 ডেসিবেল, দুজন ব্যক্তি ফিসফিস করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললে শব্দপ্রাবল্য 30 ডেসিবেল মতো আর স্বাভাবিক কথোপকথনে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 50-60 ডেসিবেলের মতো।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দ্ধারিত শব্দের নিরাপদ প্রাবল্যমাত্রা দিনের বেলায় জনবসতি এলাকায় 45 ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকা 55 ডেসিবেলের বেশি হওয়া ঠিক নয়। এমনকি 45 ডেসিবেলের শব্দও যদি আমাদের কানের কাছে একটানা হয়ে যেতে থাকে তবে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 70 ডেসিবেল হলেই আমাদের ক্ষতি হতে শুরু করে। 80 ডেসিবেলের শব্দ আমাদের শ্রবণের অসুবিধা ঘটায়, 85 ডেসিবেল শব্দ আমাদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতার পরিপন্থী। 90 থেকে 100 ডেসিবেল শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে কানের স্থায়ী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আর 130 থেকে 140 ডেসিবেলের শব্দ আমাদের একবারে বধির করে দিতে পারে। 160 ডেসিবেলের শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারে।

[মনে রাখতে হবে 20 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্য 10 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যের কিন্তু 2 গুণ উচ্চতর নয়, 10 গুণ উচ্চতর। তেমনি 40 ডেসিবেলের শব্দ প্রাবল্য 30 ডেসিবেল শব্দ প্রাবল্যের 10 গুণ, 20 ডেসিবেল শব্দ প্রাবল্যের 100 গুণ। এভাবে, 50 ডেসিবেল প্রাবল্য মাত্রার শব্দ শব্দের ন্যূনতম শ্রবণযোগ্য প্রাবল্য থেকে 1,00,000 (এক লক্ষ) গুণ উচ্চতর)]

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সভ্যতার, বিশেষ করে নগর সভ্যতার অনুষঙ্গ কয়েকটি শব্দ-উৎবের প্রাবল্যমাত্রা লক্ষণীয় ঃ

শব্দ-উৎস	শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল এককে)
রেডিওর স্বাভাবিক আওয়াজ	45
রেডিও জোরে বাজানোর আওয়াজ	70
বাজি পটকার আওয়াজ	90-120
উচ্চ গ্রামে মাইক্রোফোন বাজানোর আওয়াজ	100-110
ভারী যানবাহন চলার শব্দ	100
ঘড়ির এ্যালার্মের আওয়াজ	80
জলের পাম্পের মোটর/জেনারেটর	90-100
ছোটখাটো কারখানা	90
রক মিউজিক, পপসঙ্গীত	100-120
চলন্ত মোটর সাইকেল	110-115
এরোপ্লেন	120
জেট প্লেন (ওড়া শুরুর মুহূর্তে)	140-150

শব্দমাত্রা সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দ্ধারিত নিরাপদমাত্রা আমাদের অধিকাংশ শহরেই আমরা ছাড়িয়ে গেছি বা ছাড়াতে চলেছি। আমাদের দেশেরই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নির্দ্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার

বিভিন্ন ধরণের এলাকার শব্দ প্রাবল্যমাত্রা সম্পর্কে সামান্য ধারণা নীচের সারণীটি থেকে পাওয়া যেতে পারে ঃ

এলাকার ধরণ	নির্ধারিত মান (ডেসিবেল)		বাস্তব শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)	
	দিনে	রাত্রে	দিনে	রাত্রে
বসবাসের এলাকা	55	45	70	65
শান্ত অঞ্চল (হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)	50	40	70	65
ব্যবসা বাণিজ্যের এলাকা	65	45	82	75
শিল্পাঞ্চল	75	70	78	67

সারণী থেকে স্পষ্ট যে একমাত্র শিল্প এলাকা ছাড়া অন্য সব ধরণের এলাকাতেই শব্দপ্রাবল্য নির্দ্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা উচ্চতর। বসবাসের এলাকা এবং শান্ত অঞ্চলে শব্দ প্রাবল্যমাত্রা একই রকম আর ব্যবসা বানিজ্যের এলাকার শব্দ প্রাবল্য শিল্পাঞ্চলের তুলনায় বেশি। বিপুল সংখ্যক মোটর গাড়ির এয়ারহর্নের কর্কশ আওয়াজ আর ভারী যানবাহনের স্বল্প পরিসরে বিপুল সংখ্যায় যাতায়াত মহানগরীর ব্যবসা বাণিজ্যের এলাকার সর্বাধিক মাত্রায় শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। শান্ত এলাকায় মোটরগাড়ির হর্ন বাজানো আইনত নিষিদ্ধ হলেও এই আইনের কদাচিৎ পরোয়া করা হয়। কাজেই শান্ত অঞ্চলে আর বসবাস এলাকায় শব্দমাত্রার ফারাক নেই বললেই চলে।

কলকাতা মহানগরীর কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকার শব্দ প্রাবল্য কেমন নীচের সারণীতে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে আগের সারণীটির তথ্য মিলিয়ে দেখলে ধারণা স্পষ্টতর হবে ঃ

স্থান	এলাকার প্রকৃতি	শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল এককে)		
		সকালে	অপরাহ্নে	রাতে
যোধপুর পার্ক	বসবাস	69.1	63.6	66.4
বালিগঞ্জ (একডালিয়া পার্ক)	বসবাস	71.6	67.4	66.7
গড়িয়াহাট মার্কেট	বাণিজ্যিক	77.9	81.6	75.6
রাসবিহারী মোড়	বাণিজ্যিক	76.1	78.7	81.5
পার্কসার্কাস ময়দান	বাণিজ্যিক	81.0	77.0	76.9
নীলরতন সরকার হাসপাতাল	নিঃশব্দ	64.8	68.3	66.3
শিয়ালদহ স্টেশন	বাণিজ্যিক	69.7	76.5	71.0
কলকাতা হাইকোর্ট	নিঃশব্দ	67.0	70.3	64.6
বি.বা.দী বাগ	বাণিজ্যিক	85.6	73.3	74.5
বড়বাজার	বাণিজ্যিক	81.0	77.0	76.9
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলেজ ষ্ট্রীট)	নিঃশব্দ	64.9	65.2	52.2
শ্যামবাজার	বাণিজ্যিক	80.3	78.1	73.3
উলটোডাঙ্গা	শিল্প এলাকা	84.6	72.8	77.0
সল্টলেক (AC ব্লক)	বসবাস	72.2	70.6	60.1

(সকাল ঃ 8টা থেকে 11টা, অপরাহ্ন ঃ 2টা থেকে 3টা, রাত 9টা থেকে 12টা)

(উৎস ঃ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ)

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি এড়াতে সেই শব্দের মধ্যে থাকবার অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল/প্রতিদিন নীচের সারণীতে প্রদত্ত হল ঃ

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল এককে)	অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল (দৈনিক)
90	8 ঘন্টা
95	4 ঘন্টা
100	2 ঘন্টা
105	1 ঘন্টা
110	30 মিনিট
1115	15 মিনিট

শব্দ দূষণের বিভিন্ন ধরণের উৎস ঃ

এ তাবৎ আলোচনায় শব্দদূষণের কয়েকটি সাধারণ উৎস বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে। প্রণালীবদ্ধ ভাবে শব্দদূষণের মনুষ্যসৃষ্ট উৎস গুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা ঃ পরিবহনজাত শব্দদূষণ, শিল্পজাত শব্দদূষণ এবং গৃহাভ্যন্তরীণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিপার্শ্বিক শব্দদূষণ। শব্দদূষণের প্রাকৃতিক উৎসগুলি (যেমন, মেঘগর্জন, বাজপড়ার শব্দ ইত্যাদি) অবশ্য আলোচনার পরিধির সঙ্গে রাখা হল।

পরিবহনজনিত শব্দদূষণ ঃ

পরিবহন আবার বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন ঃ ভূতলপরিবহন, রেল পরিবহন, বিমান পরিবহন ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে ভূতল পরিবহনজনিত শব্দদূষণের সমস্যাই কোলাহল দূষণের সবচেয়ে প্রবল এ নিরবচ্ছিন্ন সমস্যা। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের মোটরযানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় এই সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। কোলাহলের প্রাবল্য এবং মাত্রা, মোটরযানের ভারী বা হালকা হওয়া, গতিবেগ, রাস্তার অবস্থা, যান চলাচলের ঘনত্ব (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহনের সংখ্যা), ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণের মান, জ্বালানির প্রকৃতি এসব বহু কিছুর উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ভারী এবং ডিজেল চালিত মোটরযানগুলিই সবচেয়ে বেশি শব্দদূষণ সৃষ্টি কারক। দিনের বিশেষ সময়ে বিশেষ অঞ্চলে যানবাহন চলাচলের চাপ সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকাকালীন ওই সময়ে শব্দে দূষণ মাত্রাও সর্বোচ্চ থাকার সম্ভাবনা। কলকাতা মহানগরীতে বর্তমানে নথিভুক্ত মোটরযানের সংখ্যা আনুমানিক দশ লক্ষ, কলকাতায় রাস্তা এলাকা যেহেতু মোট এলাকার 6 শতাংশ মাত্র, সুতরাং স্বল্প লভ্য স্থানে সুবিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচল যে মারাত্মক কোলাহল দূষণের সৃষ্টি করবে সে তো জানা কথাই। এখানে আর একটি বড়ো সমস্যা হল যাতায়াতকারী মোটরযানগুলির একটা অনুপেক্ষণীয় অংশ বহুদিনের পুরোনো এবং অনেকগুলির ইঞ্জিনই যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উৎকট আওয়াজ সৃষ্টিকারী।

রেলপরিবহন ঃ

আমাদের দেশে একসময়ে রেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। সেজন্য রেলপরিবহন জনিত শব্দদূষণ তখন তেমন মারাত্মক ছিল না। কিন্তু জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত উচ্চ হওয়ায় রেললাইন, রেলস্টেশনের খুব কাছাকাছিই বহুস্থানে জনবসতি গড়ে উঠেছে ও উঠছে, ট্রেনের সংখ্যা ও যাতায়াতের ঘনত্বও

ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই রেলপরিবহন জনিত শব্দদূষণ মাত্রা এখন আর নগণ্য নয়। ট্রেন চলাচলের শব্দ রেল লাইন, রেলস্টেশনের কাছেই বসবাসরত মানুষজনের যেমন শব্দদূষণের অসুবিধা সৃষ্টি করে, বাড়িঘরেরও কিছুটা ক্ষতি করতে পারে।

বিমান পরিবহন ঃ

আমাদের বিমানবন্দরের সংখ্যা যেহেতু খুব বেশি নয় এবং উড়ানের সংখ্যাও খুব বেশি নয় তাই বিমান পরিবহন জনিত শব্দদূষণ নিরবচ্ছিন্ন নয়। সে হিসেবে সাধারণভাবে ততখানি মারাত্মক নয় (তুলনামূলকভাবে)। তবে শব্দের প্রাবল্যমাত্রার দিক থেকে বিমান পরিবহন জনিত শব্দ বা কোলাহল অধিকতর মারাত্মক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণের পক্ষে। বিমানবন্দর থেকে বিমান ওড়া শুরু করবার সময়ে এবং বন্দরে অবতরণকালে শব্দপ্রাবল্য সর্বোচ্চ হয়। জেট বিমান এবং শব্দাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমানের ক্ষেত্রে শব্দপ্রাবল্য সাধারণ বিমানের শব্দপ্রাবল্য থেকে অনেক উচ্চতর। (জলপরিবহন জনিত শব্দদূষণ তেমন মারাত্মক না হওয়ায় এখানে আলোচিত হল না)।

শিল্পজাত শব্দদূষণ ঃ

বিভিন্ন শিল্পে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শব্দ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের এবং শিল্প সংলগ্ন এলাকার মানুষদের অসুবিধা ঘটায়। সংবাদপত্র ছাপাবার মেশিন, যান্ত্রিক করাত চালাবার শব্দ, ড্রিলিং মেশিন একটানা চলার শব্দ, কলকারখানার সাইরেনের আওয়াজ এসব শব্দদূষণ সৃষ্টি কারক।

গৃহাভ্যন্তরীণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিপার্শ্বিক শব্দদূষণ ঃ

বাড়িতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, অফিস, দোকানে-ব্যবসা ক্ষেত্রে) বিভিন্ন ধরণের মেশিন, সরঞ্জাম থেকে উদ্ভূত শব্দ বা কোলাহল দূষণের সৃষ্টি করতে পারে। এসবের মধ্যে কয়েকটি হল জেনারেটর, জলের পাম্প, ওয়াশিং মেশিন, জোর আওয়াজে চালানো রেডিও, টিভি, টেপরেকর্ডার, ভি.সি.আর, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি শব্দ দূষণের উৎস হিসেবে ক্রিয়া করতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থিত চালকল, গমকল এসব চলার আওয়াজ, বাজারের বাজারী আওয়াজ, জনজমায়েত, অনুষ্ঠানস্থলে, ধর্মস্থানে ব্যবহৃত মাইকের উঁচু আওয়াজ, মারদাঙ্গা, গোলমালের আওয়াজ ও কোলাহল দূষণের সৃষ্টি করে।

জনস্বাস্থ্যের ওপর শব্দদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ

উচ্চ প্রাবল্যের শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

শব্দ যেহেতু আমরা কান দিয়ে শুনি, তাই প্রবল শব্দ প্রত্যক্ষভাবে কানেরই ক্ষতি করে। অতি উচ্চ প্রাবল্যের শব্দের (130 ডেসিবেল বা উচ্চতর মাত্রার) মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে অনেকেরই কানে ঝাঁ ঝাঁ শব্দের গুণগুনানি অনুভূত হতে পারে। এই গুণগুণানি স্থায়ী রূপ নিলে সেই রোগকে বলে টিনিটিস (Tinnitis)। এই রোগে অনেকক্ষেত্রে কানে অসহ্য যন্ত্রণা হতে পারে আর এর তেমন কোনো চিকিৎসা নেই।

কিন্তু কানের ক্ষতি করা ছাড়াও শব্দদূষণ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যতর মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির কারণ হয়ে উঠতে পারে। একটানা প্রবল শব্দ (বিশেষত স্তরবর্জিত শব্দ) আমাদের বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে, ক্রোধপ্রবণ করে তুলতে পারে, মানসিক চাপ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিতে পারে, আমাদের বিষণ্ণ করতে পারে, আমাদের মনঃসংযোগের অভাব ঘটতে পারে, বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারে, তাদের স্মৃতি শক্তি হ্রাস পেতে পারে।

লরির চালক, শিল্পশ্রমিক এই ধরনের ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে একটু উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকেন, প্রবল আওয়াজের শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ এঁদের কাজ করতে হওয়ায় সম্ভবত এঁরা শব্দ দূষণের শিকার।

শব্দদূষণ স্নায়বিক রোগ, মাইগ্রেন বা আধকপালী, পেপটিক আলসার, কোলাইটিস, রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদরোগ, করেনারি থ্রম্বোসিস এসবের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞগণের মতে এমন কোনো শারীরবৃত্তীয় বিষয় নেই যেটি শব্দদূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হৃদরোগে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের পক্ষে প্রবল শব্দ যন্ত্রণা মারাত্মক হতে পারে। কয়েকজন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রকাশ যে শব্দযন্ত্রণার দরুণ মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মস্তিস্কের ক্ষতি হতে পারে এবং মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে এমন শিশু জন্ম গ্রহণ করতে পারে, এমনকি প্রবল শব্দ যন্ত্রণার ফলে অকালে গর্ভপাত পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। শ্রুতি বিজ্ঞানীরা গিনিপিগের ওপর শব্দযন্ত্রণার প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে রেকর্ড করা রক মিউজিক একটানা ৪৪ ঘন্টাব্যাপী লাগানোর ফলে গিনিপিগের কর্ণকোষগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে নিঃশব্দ পরিবেশে বসবাসকারী কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে তাদের শ্রবণশক্তি সাধারণত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং বহুদূরের সূক্ষ্ম শব্দের পার্থক্যও তারা ধরতে পারে। অপরদিকে নগরজীবনে তীব্র শব্দ যন্ত্রণার মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে সাধারণভাবে শ্রবণসামর্থ্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কোলাহল মুখরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তুলনামূলকভাবে অনেক নিরালা পরিবেশের সুদানের আদিবাসীদের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে যেখানে একজন মার্কিন নাগরিক 65 বছর বয়সে প্রায 40 শতাংশ শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, সেখানে একজন সুদানীর শ্রবণ ক্ষমতা তাঁর 70 বছর বয়সেও প্রায় অটুট থাকে।

অতিরিক্ত শব্দ বহুল কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রবল শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকবার ফল কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এক ধরনের বানরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সম প্রাবল্যের শব্দের মধ্যে এই বানরদের রেখে দেওয়াতে তাদের শরীরের রক্তচাপ প্রায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শব্দ উৎস সরিয়ে নেবার দীর্ঘক্ষণ বাদেও ওই রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভবতী মহিলাদের দীর্ঘক্ষণ পপ মিউজিকের আসরে থাকবার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে তাঁদরে গর্ভস্থ বাচ্চা ওই সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করেছে এবং দর্শক শ্রোতাদের সমবেত করতালে ধ্বনির সময়ে, শব্দপ্রাবল্য যখন উচ্চতম মাত্রায় পৌঁছেছে, গর্ভস্থ শিশু জোরে পা ছুঁড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করেছে।

জাপানে গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রবল আওয়াজের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী থাকা গর্ভবতী মহিলারা কম ওজনের বাচ্চা প্রসব করেছেন। এজন্য জাপানে গর্ভবতী মহিলাদের শব্দ প্রাবল্য কম এমন স্থানে গর্ভবতীকালে থাকবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন পরিচালিত সমীক্ষায় প্রকাশ ওই অঞ্চলের জনসাধারণের শতকরা প্রায় 16 জন কানে কম শোনেন। এর জন্য বিমানের উচ্চগ্রাম শব্দের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকার বিষয়টিকে অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কী করণীয় ঃ

শব্দদূষণ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং দূষণমাত্রাও অনেকাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মূলত তিন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) দূষণের উৎসেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে শব্দ প্রাবল্য কমিয়ে আনা যায়।

(খ) শব্দ উৎস থেকে শ্রোতার কানে যাওয়ার পথেই কিছুটা শব্দ আটকে দেওয়া।

(গ) শ্রোতার জন্য কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে শব্দের প্রাবল্য শ্রোতার কানের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের আগেই কিছুটা কমিয়ে দেওয়া যায়।

(ক) শব্দ-উৎসেই ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মাইক্রোফোন উচ্চগ্রামে না বাজানো, ক্যাসেটের দোকানে জোর আওয়াজে ক্যাসেট রেকর্ডার চালানো বন্ধ করা, মোটরযানে কর্কশ আওয়াজের এয়ার হর্ন ব্যবহারই পুরোপুরি বন্ধ করা, জেনারেটার সেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা বা সম্ভব না হলে জেনারেটারগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, উৎসবে জোরালো আওয়াজ সৃষ্টিকারী বাজিপটকার ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা। কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে শব্দ প্রাবল্য কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। যানবাহনে বা বিভিন্ন যন্ত্রে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, মোটরগাড়ির শব্দ হ্রাসের জন্য যুক্তরাজ্যে আচ্ছাদিত এয়ার কমপ্রেশার (বায়ু সংনমক) গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়, এর ফলে 86 ডেসিবেলের শব্দকে 69 ডেসিবেল প্রাবল্যমাত্রায় নামিয়ে আনা গেছে। আমাদের দেশেও মোটরগাড়িতে অনুরূপ ব্যবস্থা নিয়ে মোটরযানজনিত শব্দদূষণ মাত্রা অনেকটা কমানো সম্ভব। পাতালরেলে, চক্ররেলে, ট্রামে (বা বিমানেও) উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগে শব্দদূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হওয়া এখনই প্রয়োজন। ভারতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রক আইন প্রণীত হয়নি, অবিলম্বে এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রণীত ও প্রযুক্ত হওয়া জরুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উন্নত দেশগুলিতে প্রাসঙ্গিক আইন বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। কানাডা সরকারের আইন অনুযায়ী নাগরিকদের রেডিও, টিভি, টেপরেকর্ডার এসবের শব্দ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে প্রতিবেশীদের কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের এখানে সরকার বা পুরসভাগুলি অবিলম্বে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করুন। একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবল শব্দই সাধারণত শব্দ দূষণ ঘটায়, তাই অনেকক্ষেত্রে একটানা শব্দকে ভেঙ্গে দিয়ে শব্দদূষণ কিছুটা কমানো যায়। যেমন, স্কুল কলেজে আগে যেমন ঘন্টা বাজানো হত (হাতুড়ির সাহায্যে) একটানা শব্দের আওয়াজের (বৈদ্যুতিক ঘন্টার) বদলে তেমনটা আবার চালু করা যেতে পারে। লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনেও একটানা শব্দের বাঁশি বাজাবার বদলে ঘন্টাধ্বনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে (যেমনটি অনেক উন্নত দেশেই করা হচ্ছে)।

(খ) শব্দ উৎস থেকে শ্রোতার কানে যাওয়ার পথেই কিছুটা শব্দ আটকে দেওয়া ঃ শব্দপ্রবণ এলাকায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে ঘনসংবদ্ধভাবে শব্দশোষক নির্বাচিত বৃক্ষ-লতা এসব লাগিয়ে শব্দের প্রাবল্য অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে। তেমনি কলকারখানার আওয়াজ খুব বেশি পরিমাণে বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ওইসব কলকারখানাকে ঘিরে ঘনসংবদ্ধভাবে গাছপালার আবেষ্টনী গড়ে তোলা যেতে পারে।

এই ধরনের কারখানার মেঝে, দেওয়াল এবং ছাদ শব্দশোষণকারী পদার্থ দ্বারা নির্মাণ করেও শব্দদূষণ কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। হাসপাতাল, ছোটদের স্কুল এসবকে ঘিরেও (ফাঁকা স্থান লভ্য হলে) গাছপালার ঘন আবেষ্টনী তৈরী করা প্রয়োজন।

বাড়িঘরে বা অন্যত্রও ধাতু নির্মিত আসবাবপত্র অপেক্ষা কাঠের তৈরি আসবাব ব্যবহারই শ্রেয়। কারণ কাঠের তৈরি আসবাব কিছুটা শব্দ শোষণে সমর্থ। কলকাতা মহানগরীতে (বা অন্যান্য বড়ো শহরেও) যানবাহন অধ্যুষিত এলাকায় বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যে অজস্র হোর্ডিং ব্যবহার করা হয় সেগুলি যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে শব্দদূষক পদার্থ দিয়ে নির্মিত হয় তাহলে সেগুলিও শব্দ যন্ত্রণা কিছুটা কমানোর সহায়ক হতে পারে (রাস্তার দুধারে বা মাঝখান দিয়ে

লাগানো গাছপালার সারিও শব্দ শোষণে উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে —একথা বলাই বাহুল্য)। বাড়িঘরের জানালা শব্দপ্রবণ রাস্তার দিকে থাকলে জানালায় ভারী পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। বাড়িতে জেনারেটার, জলের পাম্প এসব প্রবল আওয়াজ সৃষ্টিকারী জিনিস থাকলে সেগুলি শোবার ঘর থেকে বা ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর থেকে যাতে যথাসম্ভব দূরে থাকে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রেডিও, টিভি, টেপরেকর্ডার কম আওয়াজে চালাতে হবে।

অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে জেনারেটার, জলের পাম্প এসব ব্যবহৃত হলে এসবকে সুনির্বাচিত স্থানে শব্দশোষণ পদার্থ নির্মিত ভারী প্যাডের ওপর স্থাপন করে যথাযথ আবেষ্টনী তৈরি করে শব্দপ্রাবল্য মাত্রা কিছুটা কমানো যেতে পারে।

(গ) শ্রোতার অভ্যন্তরে শব্দ প্রবিষ্ট হবার পূর্বে শব্দপ্রাবল্য কমিয়ে দেওয়া ঃ শ্রোতার কানে প্রবেশরত শব্দের প্রাবল্য কমিয়ে আনতে কানে ব্যবহার করবার উপযোগী বেশ কিছু জিনিস এখন পাওয়া যায় যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ার ক্যাফ, নয়েজ হেলমেট ইত্যাটি। শব্দপ্রবণ এলাকায় যাঁরা কাজ করেন কাজের সময়ে তাঁরা কানে এসব পরে নিতে পারেন। কানের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন তেলে ভেজানো তুলো কানে গুঁজেও এরা কাজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে শব্দ যন্ত্রণা থেকে এঁরা কিছুটা রেহাই পেতে পারেন।

নতুন করে পরিকল্পিতভাবে যেখানে নগরায়ন হচ্ছে বা হবে সেখানে উচ্চ শব্দ উৎস সমূহের অন্তত কয়েকটিকে বসবাস এলাকা বা নিঃশব্দে এলাকা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন বিমানবন্দর জনবসতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা দরকার, রেলস্টেশন বা রেল পরিবহণ ব্যবস্থা বসতি এলাকার বাইরে দিয়ে হওয়া উচিত।

আমাদের অধিকাংশ গ্রামগুলি যেহেতু আধা শহরের চেহারা নিয়েছে, নগর সভ্যতার অন্যান্য অনুষঙ্গের মতো শব্দদূষণের সমস্যা থেকে এমনতর গ্রামাঞ্চলও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শব্দদূষণ তাই আজ গ্রাম শহর নির্বিশেষে প্রায় সর্বত্রই একটি অনুপেক্ষণীয় পরিবেশ সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে তাই সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারী আইন প্রণয়ন, এসবের কঠোর প্রয়োগ যেমন জরুরী, তেমনি জনসাধারণের সকল অংশের মধ্যে এ বিষয়ে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে কাঙ্খিত ফললাভ সম্ভব নয়। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়ন, সেই আইনের কঠোর প্রয়োগে আন্তরিক সরকারী প্রয়াসের সাথে সাথে সচেতন জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে এ সমস্যার মোকাবিলায় -নতুবা শব্দব্রহ্মবাণের আঘাত থেকে আমরা রেহাই পাব না।

প্রান্তীয় মন্তব্য ঃ

শব্দদূষণ সম্পর্কিত সচেতনতা গড়ে তুলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও একটা উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে - ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাম্য সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত করে বৃহত্তর সমাজে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়ে।

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ শিখন-পাঠন এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মানসিক -শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর শব্দদূষণের প্রভাব সম্পর্কিত তুলনামূলক গবেষণা অথবা সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পৃথিবীর বহনযোগ্য উন্নয়ন

প্রবুদ্ধনাথ রায়

পৃথিবীর মানুষের আবির্ভাব খুব বেশী দিন আগে নয়। পৃথিবীর বয়স বা জীবের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স নিতান্তই নগণ্য। পৃথিবীর বয়সের একের দশহাজার মানুষের বয়স আর জীবের বয়সের একের এক হাজার মানুষের বয়স, অর্থাৎ মানুষ প্রজাতি তুলনামূলক ভাবে নবজাতক। আর এই জাতকের বিশেষ কোন প্রতিরোধ ক্ষমতাও নেই যে জীবের যা অবশ্যম্ভাবী নিয়তি অর্থাৎ অবলুপ্তি তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। মানুষ ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছে যে সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকাই একটি কঠিন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। যেভাবে পৃথিবীর জীবন-সহায়ক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটছে তাতে সে আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

মনুষ্য কি সত্যিই একটি বিপন্ন প্রজাতি ? এমনটা নয় তো যে মনুষ্যকুলের একটি দুর্ভাগা অংশমাত্র এই বিপদের শিকার হবে, সমস্ত মনুষ্য প্রজাতি নয় ? কোন প্রজাতির বিপন্নতা বলতে বুঝায় সেই প্রজাতির জনসংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে নির্ধারিত একটি সীমার নীচে চলে যাওয়া। সেই নিরিখে মনুষ্য প্রজাতি তো বিপন্ন নয়, মনুষ্য প্রজাতির জনসংখ্যা তো মোটেই কমছে না, তার বসতি স্থানের কোন সঙ্কোচনও তো ঘটছে না। শুধু জলে স্থলেই তার দখলদারি নয়, সৌরশক্তির ভোগেও তার নিজের অধিকার মানুষ ক্রমাগতই কায়েম করে যাচ্ছে — পৃথিবীর গাছপালা ইত্যাদিতে যে সৌরশক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে তার 40 শতাংশই মানুষ তার নিজের কাজে লাগাছে। কৃষিকাজ সম্প্রসারিত করে, বনাঞ্চলের উন্নয়ন ঘটিয়ে, নগরায়ন করে সৌরশক্তির ব্যবহার যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তাতে অন্যান্য প্রজাতির জন্য ঐ শক্তির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। তবে কি অন্যান্য প্রজাতি, আমরা নই, যারা আজ বিপন্ন ?

প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ থাকতে পারে না। চারিদিকে জীবের, গাছপালার যে পরস্পর নির্ভরতার সম্পর্কের জাল তার বাইরে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবপরই নয়। মানুষের স্বাস্থ্যহানির যে ঝুঁকি আজ প্রকট তার কারণ কিন্তু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে দূষিত স্থানীয় পরিবেশ নয়, অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন পার্থিব সম্পদের (যথা, তেল, ধাতু, কাঠ ইত্যাদি) সাযুজ্য রক্ষায় ম্যালথুসীয় অক্ষমতা নয়। বরং প্রাকৃতিক বহন ক্ষমতার ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের জন্য যে বিপর্যয় আসন্ন, সেটাই সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ। আমাদের গ্রহের বিশোষণ, হৃতসম্পদের পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নবীকরণের যে বিপাক ক্ষমতা তার ওপরে মানুষের নির্বিচার অত্যাচার যে সমূহ বিপদকে ডেকে আনছে সেটাই আজ সবাইকে ভাবিত করে তুলছে। সামগ্রিক যে ফলাফল এতে দাঁড়াচ্ছে তাতে নানা ধরণের ভারসাম্য চিড় খাচ্ছে এবং জীবনকে পোষণ করার ক্ষমতা পৃথিবী ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছে। এই মাত্রাতিরিক্ত চাপের কিছু দৃষ্টান্ত যথা, ভূমিক্ষয়, আগেও স্থানীয় আকারে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ দৃষ্টান্তের উদ্ভব হয়েছে মানুষের সাম্প্রতিক কালের সামগ্রিক কার্যকলাপ থেকে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্রমাগত বৃদ্ধি, শান্ত মণ্ডলে অবস্থিত ওজনস্তরের ক্ষতি সাধন, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং ঘনবর্ষণ বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধন। প্রত্যক্ষভাবে বিষাক্ত করণ বা নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদের নিঃশেষ করণের মাধ্যমে এরা ক্ষতিসাধন করছে না। অন্যভাবে, অর্থাৎ মাটি, বন, সমুদ্র এবং জীববৈচিত্র্যের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে অথবা জলবায়ু, সমুদ্রস্তর অথবা অতিবেগুনী আলোর সমস্যা বাড়িয়ে বিশ্বের প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় সাধন করছে। এই সব ক্ষতিকারক কার্যাবলীর ফলাফল কি হবে আগে থেকে বলা কঠিন এবং কিভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব তার হদিশ দেওয়াও মুশকিল। অথচ আজ যারা মনুষ্য স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত তাদের কাছে এটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলাফল বিষয়ে বিভিন্ন সময়কালের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের একটি নমুনা পাওয়া যায়। আগে আমাদের উদ্বেগ ছিল বিষাক্ত গ্যাসীয় নিঃসরণের মাত্রা ধোঁয়াসার গাঢ়ত্বের কাছাকাছি হলে মৃত্যুর আশঙ্কা। পরবর্তী

সময়ে আমাদের দুর্ভাবনা ছিল আমাদের সমাজে শক্তি ব্যবহারের যে রমরমা তাতে জীবাশ্ম জ্বালানির, যেমন তেলের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আজ আমাদের উপলব্ধি একটু অন্য ধরণের — আমরা ধোঁয়ার নলের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করেছি, জীবাশ্ম জ্বালানির মজুত যে আরও কয়েকশত বছর স্থায়ী হবে সে বিষয়েও নিশ্চিত হয়েছি, অথচ যে সমস্যার আজ আমরা সম্মুখীন হয়েছি তার প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তাপকে ফাঁদে আটকে রাখার মত গ্যাস, যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, তার মারফৎ আমরা পৃথিবীর বায়ুস্তরের ওপর যে মাত্রাতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করছি তার ফলে জীবমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্র, প্রক্রিয়া ইত্যাদি যার ওপর আমাদের জীবন-সহায়ক ব্যবস্থা নির্ভরশীল তার ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা।

বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার কাছে আমরা নানা ভাবে ঋণী। বহুধরণের পরিষেবা এই ব্যবস্থা আমাদের দিচ্ছে। এই ব্যবস্থা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বহু বিষয়ের উৎস, যথা জল, প্রাণী ও গাছপালার খাদ্য এবং পুনর্নবীকরণ যোগ্য সম্পদ। এই ব্যবস্থা আমাদের জীবনভাণ্ডারের সংরক্ষণ করে, যে সব প্রক্রিয়া মাটি সংরক্ষণ করে এবং নতুন মাটির সৃষ্টি করে তাদের পরিপোষণ করে, পুষ্টিকর খাদ্যের ভগ্নাংশ পুনঃব্যবহারযোগ্য করে তোলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, দূষক পরিস্রুত করে, বর্জ্যপদার্থের খালাস স্থল হিসেবে কাজ করে, শস্যে পরাগমিলন ঘটায়, উদকচক্র পরিচালনা করে এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের কাঠামো সংরক্ষণ করে।

যেহেতু মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজন এই সব পরিষেবা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেইহেতু আমরা যেভাবে নিয়ম করে আমরা আমাদের উৎপাদিত পুঁজিভাণ্ডার যথা, রাস্তাঘাট, দালানবাড়ী এবং যন্ত্রপাতির খবরাখবর করি ঠিক সেইভাবে এই বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার ওপরও নজরদারি করা বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নীতিটি একেবারেই চালু নয়। এখনও পর্য্যন্ত এই নজরদারি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়নি। যে রীতি চালু আছে তা হল আর্থব্যবস্থার মোট উৎপাদন (যথা, কৃষিজ উৎপাদন, মৎস্য এবং বনজ উৎপাদন) এবং তার দামের ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা যে সম্পদের ভিত্তির কোন হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছে কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রথাটি কোনভাবেই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কৃষিজ উৎপাদনের প্রবণতা একটি ক্রমবৃদ্ধির সঙ্কেত দিলেও একই সময়ে হয়ত দেখা যাবে যে ব্যাপকহারে জমির ক্ষতিসাধন হচ্ছে। মনে রাখতে হবে পরিবেশগত সম্পদের ভিত্তি একটি গতিশীল জটিল জীবন্ত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রাণী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক পরিবেশের অবিরাম পারস্পরিক আদান প্রদান চলছে। মাঝে মাঝে এই আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে, ফলে সম্পদের ভিত্তিতে ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে। সেই কারণে এই ভিত্তি থেকে পরিষেবার যে প্রবাহ উদ্ভূত হয় তাতেও বিঘ্ন দেখা দিতে পারে এবং তারও ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়।

অতিমাত্রায় সম্পদ উত্তোলন, মাত্রাতিরিক্ত জমির ব্যবহার ইত্যাদিতে পরিবেশগত সম্পদের যে ক্ষতিসাধন ঘটে তাতে বাস্তু ব্যবস্থা সৃষ্ট পরিষেবার যে শুধুমাত্র পরিমাণ বা গুণ ব্যাহত হয় তা নয়, তার স্থিতিস্থাপকতাও সঙ্কটাপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপকতা বলতে বুঝায় অস্থিরতা বা আকস্মিক কোন অভিঘাতের পর কোন ব্যবস্থার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা। যখন কোন ব্যবস্থা এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অল্পকারণেই সেই ব্যবস্থা নতুন কোন অবস্থানে উপনীত হয়। বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্ততার অঢেল সম্ভাবনা অথবা সঙ্কটকালে সম্পদের এক অবস্থান থেকে অন্য কোন অবস্থানে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারে অর্থনীতিবিদ্‌দের যে প্রত্যাশা তা কিন্তু বাস্তুতান্ত্রিক সত্য বা বাস্তবতার সঙ্গে সুসমঞ্জস নয় । আসল কথা হল বাস্তুব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা একান্তই সীমিত। আর এই স্থিতিস্থাপকতার হ্রাসবৃদ্ধি সহজে বোধগম্য করাও কঠিন। এই কারণে বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি এত দুর্বোধ্য।

বাস্তুব্যবস্থার বহনক্ষমতা বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ একটি নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত না হয়ে সর্বাধিক কতটা চাপ সেই ব্যবস্থা সহ্য করতে পারে। ঝড়ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো প্রায়শঃই বাস্তুব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। এই কারণে এটা মনে করা কখনই সঙ্গত হবে না যে প্রাকৃতিক সম্পদ একটি নির্দিষ্ট মজুত যার কোন পরিবর্তন নেই বা যা থেকে উদ্ভূত কোন পরিষেবার প্রবাহেও কোন বিঘ্ন ঘটে না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবর্তন ঘটেছে। পরিবেশে যে তারতম্য বা পরিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদ বিবর্তিত

হয়েছে। বাস্তুব্যবস্থার নিজেকে সংগঠিত করার ক্ষমতাই নির্ধারণ করে বিভিন্ন অস্থিরতা মূলক কার্যকালে বাস্তুব্যবস্থা কতটা সাড়া দিতে পারে। বাস্তুব্যবস্থার বিবর্তনে জীববৈচিত্র্য দুটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রথমতঃ সে সেই সব জীবের সৃষ্টি করে যাদের মাধ্যমে শক্তি ও পদার্থ সঞ্চালিত হয় এবং এদের সাহায্যে বাস্তুব্যবস্থাকে সে তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ বাস্তু ব্যবস্থাকে সে তার স্থিতিস্থাপকতা ধর্মটি প্রদান করে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাটি আলোচিত হয় প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বহনশক্তির প্রেক্ষাপটে। কিন্তু সেই আলোচনায় ম্যালথুসের প্রভাব অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে এবং বহনশক্তির বিষয়টি একান্তভাবেই খাদ্য সমস্যার প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এটা অবশ্য হওয়া উচিত ছিল না। ম্যালথুস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এম.জে.এন. কণ্ডারসেটের ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি বইয়ের উল্লেখ করেন যাতে লেখক জনসংখ্যা ভরণপোষণের রসদ অতিক্রম করে গেলে কি ধরণের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কণ্ডারসেট কিন্তু একান্তভাবে খাদ্যের ওপরেই জোর দেন নি, যদিও ম্যালথুস তার ভাষ্যে সেই কাজটাই করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীতে খাদ্যোৎপাদন কি পৃথিবীর জনসংখ্যার চেয়ে কম হচ্ছে ? এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদনের গতির কোন নিম্নাভিমুখ দেখা যায় নি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যোৎপাদনের প্রবণতা এক নয়। সাম্প্রতিক কালে এশিয়াতে অর্থাৎ যেখানে উন্নয়শীল দেশগুলির জনসংখ্যাবৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ ঘটে থাকে, সেখানে কিন্তু মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে। সমস্যা সঙ্কুল দেশ হচ্ছে আফ্রিকা। সেখানে মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন কমেছে। বিশেষ করে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এই সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে খাদ্যোৎপাদনের সমস্যা দু'রকমের। এক, সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে একটি ভারসাম্য আনার প্রশ্ন। দুই, বিশেষ বিশেষ দেশ এবং অঞ্চলে খাদ্যোৎপাদন এবং জনসংখ্যার বহনের মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রশ্ন। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে চীন কতগুলি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, যথা 'একশিশু নীতি' এবং মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক অধিকার (যথা, আবাসন) কে জন্মের সংখ্যা সংক্রান্ত সরকারী বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে শর্তাধীন করা। চীনে জন্মহার দ্রুত নেমে গেছে — চীনে জন্মহার প্রতি হাজারে ২১ যেখানে ভারতে প্রতিহাজারে ৩০। একটি অভিমত এ থেকে গড়ে উঠছে যে বাধ্যতামূলক নীতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যতটা কার্যকরী অন্য কোন ব্যবস্থা ততটা নয়। অভিমতটা যে সবটাই গ্রহণযোগ্য তা কিন্তু নয়। যেমন, চীনের জন্মহার কিন্তু ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালার চেয়ে কম নয়। ভারতে জন্মহারের অঞ্চল বিশেষে নানা তারতম্য দেখা যায় এবং এই তারতম্যগুলোর কারণ হচ্ছে জীবন-প্রত্যাশা, মৃত্যুহার, শিক্ষা (বিশেষ করে নারী শিক্ষা), স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবার পরিকল্পনার বিবিধ সরঞ্জামের লভ্যতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই কেরালার রেকর্ড খুব ভাল এবং কেরালার জন্মহার কয়েক দশকের মধ্যেই হাজারে ৪৪ থেকে হাজারে ২০ তে নেমে এসেছে। কেরালার এই সাফল্য কিন্তু কোন বাধ্যতামূলক নীতির প্রয়োগে সম্ভব হয় নি অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর আঘাত হেনে আসেনি, এসেছে পরিবার পরিকল্পনায় পরিবারের অধিকার স্বেচ্ছায় খাটিয়ে।

কেরালার এই সাফল্যের পেছনে আছে ছোট পরিবার গঠনে নানা ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎসাহ দানের ব্যবস্থা। সেখানে মৃত্যুহার কমেছে, পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা বেড়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সেগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষিত কেরলীয় মহিলাদের ক্রমাগত শিশু ধারণ ও পালনের প্রতি অনীহা বেড়েছে এবং এসবের ফলে সেখানে জন্মহার যেভাবে কমেছে তাতে ম্যালথুসও হয়ত হতবাক্ হতেন। আধুনিক পরিবারে জন্মহার কমানো যে একটি অত্যাবশ্যক কর্তব্য এই সাধারণ বোধ সৃষ্টিতে জনশিক্ষা এবং খোলাখুলি আলোচনার একটি মস্তবড় ভূমিকা ছিল। কণ্ডারসেটও নারীশিক্ষা এবং জনসাধারণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার ওপরে যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন।

লিঙ্গবৈষম্য ভারত এবং চীনে বেশ ভালভাবেই বর্তমান। অথচ কেরালায় কিন্তু এই বৈষম্য উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। নারী শিক্ষার দীর্ঘ ইতিহাস কেরালায় এই জাগরণ সৃষ্টি করেছে। নারী-পুরুষের অনুপাত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় ১ এর অনেক ওপরে। চীনে এবং ভারতে এই অনুপাত কিন্তু বেশ কম, যথাক্রমে ০.৯৪ এবং ০.৯৩। পক্ষান্তরে, কেরালায় এই অনুপাত ১ এর বেশ ওপরে, যেমনটা ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায়।

পৃথিবীর বহনশক্তির সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই একমাত্র বা শেষ কথা নয়। বাস্তু ব্যবস্থার (যেখানে প্রাণী এবং পরিবেশের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের গুরুত্ব খুব বেশী) প্রেক্ষাপটে বহনশক্তির ওপর চাপের বিষয়টি আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিক কিছু আলোচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে যে ধরণের ধারণাগুলি উঠে এসেছে তাতে উক্ত প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বলা হচ্ছে খৃষ্টের জন্মকালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৫০ মিলিয়ন, চতুর্দশ শতাব্দীতে তা হল ৫০০ মিলিয়ন, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১ বিলিয়ন, ১৯৩০এ ২ বিলিয়ন, ১৯৮৮তে ৫ বিলিয়ন এবং ২০৩০ খৃষ্টাব্দে অনুমিত জনসংখ্যা হবে ৯ বিলিয়ন। আমাদের এই মনুষ্য প্রজাতির জনসংখ্যা প্রথম বিলিয়নে পৌঁছতে সময় লেগেছে ২০০,০০০ বছর, অথচ আগামী ২০০ বছর লাগবে আরও ৮ বিলিয়ন সংখ্যা যোগ করতে অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ তখন গিজগিজ করবে। এই আসন্ন সঙ্কটের কথা মাথায় রাখলে বাস্তুব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা দরকার।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্থা (FAO) সারা বিশ্বের বহনশক্তির ওপর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ১১৭টি দেশের প্রত্যেকটির সম্ভাব্য খাদ্যোৎপাদনকে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সম্ভাব্য খাদ্যোৎপাদন কৃষিতে কি প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু প্রযুক্তি প্রয়োগ বিভিন্ন স্তরের হতে পারে , (FAO) নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্তর বিন্যাসের কথা বিবেচনা করেছে ঃ

(ক) **নীচু স্তর ঃ** চিরাচরিত শস্য উৎপাদনে যে প্রযুক্তি সার, কীটনাশক অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করে না, যে প্রযুক্তিরর কোন দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই।

(খ) **মধ্যবর্তী স্তর ঃ** যে প্রযুক্তিতে কিছু পরিমাণ সার, ছত্রাক নাশক, কীট বা আগাছানাশকের এবং কিছু উন্নতমানের শস্যের ব্যবহার আছে এবং যার নিজস্ব মৌলিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে।

(গ) **উচ্চ স্তর ঃ** যে প্রযুক্তিতে পুরোমাত্রায় সার ও ছত্রাক নাশক, কীট ও আগাছানাশকের এবং উন্নত মানের শস্যের ব্যবহার হয়, তাছাড়া উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং সব থেকে ভাল কৃষি ব্যবস্থাপনা আছে।

এই বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তির স্তর বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে শস্যের সম্ভাব্য ক্যালোরির উৎপাদন নির্ণয় করা হয়। শস্যের এই সম্ভাব্য ক্যালোরি উৎপাদনকে FAO ও WHO অনুমোদিত প্রতিটি দেশে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ দ্বারা ভাগ করে ১৯৭৫ ও ২০০০ সালের জন্য প্রতিটি দেশে কি আয়তনের জনসংখ্যা বাঁচিয়ে রাখা যায় তার সম্ভাব্য হিসেব করা হয়েছে।

নীচের সারণীতে এই ফলাফল বিবৃত হল। এখানে ২০০০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রযুক্তির বিভিন্ন স্তরে সম্ভাব্য যে জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে তাকে প্রত্যাশিত জনসংখ্যার অনুপাত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বিশ্বের নানা অঞ্চলে বহন শক্তি (জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটার) তিন প্রকার ঃ

প্রযুক্তি স্তর	আফ্রিকা	দঃ পঃ এশিয়া	দঃ আমেরিকা	মধ্য আমেরিকা	দঃ পূঃ এশিয়া	গড়
নীচু	১.৬	০.৭	৩.৫	১.৪	১.৩	১.৬
মধ্যবর্ত্তী	৫.৮	০.৯	১৩.৩	২.৬	২.৩	৪.২
উচ্চ	১৬.৫	১.২	৩১.৫	৬.০	৩.৩	৯.৩

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াকে বাদ দিয়ে সর্বনিম্ন প্রযুক্তি স্তরেও অন্য সব অঞ্চলগুলি তাদের প্রত্যাশিত জনসংখ্যা থেকেও বেশী জনসংখ্যাকে ২০০০ সালের মধ্যে বহন করতে সক্ষম। এর বেশী উচু প্রযুক্তি স্তরে উন্নতশীল পৃথিবী সামগ্রিক ভাবে ২০০০ সালে তার প্রত্যাশিত জনসংখ্যার তুলনায় ৯.৩ গুণ বৃহৎ জনসংখ্যাকে বহন করতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রযুক্তিস্তর যত উন্নত হয় অঞ্চল গুলির বহনক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সারণীতে

তাই আশাবাদী চিত্র পাওয়া যায়। পরিসংখ্যান একটু পুরোনো হলেও স্বল্পকালের ব্যবধানে তার প্রাসঙ্গিকতা অটুটই আছে। বহনক্ষমতার প্রভূত উন্নতিবিধানের ব্যাপারে প্রযুক্তির উৎকর্ষণ যে গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট। কিন্তু এই চিত্র যতটা আশানুরূপ বলে মানা হচ্ছে ততটা আশানুরূপ নয়।

এটা প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে বহনক্ষমতা বলতে শুধুমাত্র সর্বাধিক যে পরিমাণ জনসংখ্যাকে কোন নির্দিষ্ট সম্পদ বহন করতে পারে তাকে বুঝায়, তা কখনই অভিপ্রেত জনসংখ্যাকে বহন করার কথা বলে না।

দ্বিতীয়ত ঃ বহনক্ষমতা সবসময় ন্যূনতম ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সেই কারণে এই ধরণের প্রক্রিয়াতে পুষ্টির মাত্রা বাড়ানোর কোন অবকাশই নেই।

তৃতীয়ত ঃ ২০০০ সালের সময়সীমার মধ্যে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়াতে এমন কিছু উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয় যার ফলে উচ্চ প্রযুক্তির বাস্তবে কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে।

চতুর্থত ঃ এই প্রক্রিয়াতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে যাবতীয় চাষযোগ্য জমি শুধুমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হয় যা স্পটতঃই সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার অতিরঞ্জন।

প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। FAO 'র পর্যালোচনা শুধুমাত্র খাদ্যশস্য সম্পর্কিত বহন ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সম্পদের অভাব সম্পর্কিত কোন আলোচনা এতে নেই অথচ যার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, যে প্রভাব জমির অভাবে পৌঁছবার আগেই কার্যকরী হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জ্বালানী কাঠের লভ্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। পশ্চিম আফ্রিকার সাহেলিয়ান ও সুদানীয় অঞ্চলের ওপর একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য, পশুশক্তি ও জ্বালানী কাঠের সীমা দ্বারা বহনক্ষমতা নির্ধারিত হয়। নিম্নে এর ফলাফল প্রদত্ত হল।

পশ্চিম আফ্রিকার সাহেলিয়ান ও সুদানীয়ান অঞ্চলের বহন ক্ষমতা (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা) ঃ

অঞ্চল	পোষণ সম্ভব জনসংখ্যা			প্রকৃত গ্রামীণ জনসংখ্যা	পোষণ সম্ভব জনসংখ্যা ঃ জ্বালানী কাঠ	প্রকৃত মোট জনসংখ্যা
	শস্য	গৃহ পালিত পশু	মোট			
সাহারাণ	—	০.৩	০.৩	০.৩	—	০.৩
সহেলো সাহারাণ	—	০.৩	০.৩	২	—	২
সাহেলিয়ান	৫	২	৭	৭	১	৭
সাহেলো সুদানীয়ান	১০	৫	১৫	২০	১০	২৩
সুদানীয়ান	১৫	৭	২২	১৭	২০	২১
সুদানো গিনিয়ান	২৫	১০	৩৫	৯	২০	১০

এই সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে জ্বালানী কাঠের বহন ক্ষমতা চিরাচরিত প্রযুক্তি দ্বারা উৎপন্ন শস্যের বহন ক্ষমতা কম। আবার তিনটি অঞ্চলের জ্বালানী কাঠের বহন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তুলনামূলক ভাবে অন্য তিনটি অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও পশুশক্তির বহনক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং বহনক্ষমতা সারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ চিত্র সম্পদের সামগ্রিক বহনক্ষমতার সমস্যাটি লঘু করে দেখায়। আসল কথা হল কোন সম্পদের অভাব প্রথমে সঙ্কট সৃষ্টি করে, সেটা দেখা।

VOCATIONAL EVALUATION - A KEY FACTOR IN REHABILITATION

Ms. P. Chandrika Rani

Rehabilitation is a process of restoration of people with disability to the fullest physical, mental, social, vocational and economic usefulness of which they are capable. The vocational aspect being one of the major components of the whole process, the value of a scientific evaluation process of the individuals afflicted with disability cannot be underscored. Thus the process of Vocational Evaluation of the persons with disability involves the assessment of pertinent medical, psychological, educational, social, environmental, cultural and vocational factors, which could affect successful employment/placement of the persons with disability.

The Medical evaluation deals with the detection or diagnosis, treatment and medical rehabilitation like physiotherapy, use of orthotics and prosthetics etc. It also helps the Rehabilitation Professionals to know about the residual potential and decide about restricted areas of work environment.

The assessment programs in the psychological and work fields provide precise information about the person's strengths and weaknesses in the areas such as learning ability, speed, dexterity, quality/quantity of work, short & long term memory, ability to write/read/speak, follow oral/written instructions, job skills and the restricted areas of occupation. Along with these, the information on various other factors like inter-personal relationship with co-workers, work behaviour, motivation, interest in addition to those listed in Interest Tests, work readiness, health, self-care, transportation problems or family concerns such as need for health care etc. is also obtained during the vocational evaluation process.

The process of vocational evaluation employs different methods in ascertaining the vocational capabilities of a person viz. observation, psychological assessment, evaluation in the workshop utilizing work as a means of evaluation, sheltered workshop etc.

WORK AS A MEANS OF EVALUATION

The most direct and unbiased way of predicting the vocational success of an individual is to try him/her on that particular job. However in rehabilitation settings :

Utilization of a sample of behaviour in the similar surroundings of a factory or office is not possible and usually it is not feasible to try the person with disability out in real job situations ;due to various practical difficulties like unwillingness on the part of employers

in accepting the person with disability in their firm or the probable interference in routine work of the firm. Thus the evaluation process has to be modified with the development of work samples which could be the best alternative in the context of the practical difficulties for evaluation in real job situations. In the settings of a vocational rehabilitation Centre the workshops provide a situation wherein the evaluator gets an understanding of the person as a functional worker. Focusing the person's behaviour in various aspects with the background of different trades with all its infrastructure the development of systematic work sample in different areas or trades can be carried out for predicting vocational success in selected trades.

WORK SAMPLE AS A METHOD OF WORK-EVALUATION :

A work sample is an abbreviated work activity that closely resembles an actual business or industrial operation. The use of work samples in vocational evaluation attempts to expose the person to the job factors and essential aspects that are typical of job and such samples can be more useful than aptitude test which may not be feasible in case of persons with language, educational and cultural limitations.

A work sample is directly related to the vocational activity of a particular field and hence the evaluator gets a better understanding not only about the employability of the person in the specific job but about the various tasks and levels which can be attained by a person in a particular trade.

The use of work sample gives an opportunity to the evaluator to compare the performance of a disabled person with the performance of successfully employed persons.

The work sample has its own value as it is directly related to the vocational activity.

PREPARATION & CONSTRUCTION OF A WORK SAMPLE :

The rationale underlying the work-sample is that by utilizing a sample of work behavior in a particular activity series; the evaluation can be done from general to specific, the most general being a judgment that the individual is employable rather than unemployable. A specific judgment would be concerned with predicting future performance in one particular job level within a particular occupational field. To describe further, by utilizing a work sample it should be possible to determine whether the person shows enough skill and appropriate behaviour to be considered in ascertaining his/her success in a job situation.

In the next stage, we should be able to determine the job category to which the person can be recommended with his/her abilities displayed during his/her performance in the work-sample. By going little more specific; is the prediction of a skill level, which the individual is capable of achieving within a particular activity. For, example, if we find a particular person to be able to be employed in clerical field with a minimum standard of language in written comprehension stages, and also the other components like numerical ability, accuracy, and speed, it should then be determined to what level of a clerical job the person can attain, whether he/she has capacity to come up to a supervising

level or remain in the reception dispatch level.

Similar work-samples can be constructed in the areas of electronics, machine assembly, carpentry, tailoring etc. in order to assess whether the person can be trained for taking up different levels of skilled work. For the purpose, the work samples should be constructed as a series of simple and complex activities.

The work sample technique can also be utilized to determine the capacity of the person to perform the job that is related to the sample. This is usually called the Job Family Prediction. The rationale is that operations in related/allied trades require similar mental ability, dexterity, skill and tool usage.

In order to make the work sample as objective as possible it is recommended that the selected activity should be tried over a minimum number of disabled persons as the degree and nature of disability permits and also develop necessary norms with the quality, output and time factor as major components in the completion of the related tasks. The development of necessary norms and procedure would make the administration of work sample in the most objective way possible and also to compare the person's performance with that of other disabled as well as able-bodied counterparts in the same field.

The nature of work sample administered from lower to progressively higher complexity levels assists the evaluator to ascertain the skill levels to which a person can reach in a particular area of work. It should be conducted and administered in such a way that the client is tried over a period of one to several days over different samples so that a real assessment of his/her potentials for successfully functioning in an actual job situation could be done. It allows the disabled person to demonstrate his/her varying levels of performance over a particular period of time.

A work sample standardized with required norms and a descriptive manual should be able to provide the evaluator with the necessary data on the work potential of the person with disability.

DEVELOPMENT AND UTILITY OF WORK SAMPLE :

The importance of development and the utility of a work sample stands more important taking into consideration the fact that in a country like ours, the evaluation/ training unit attached to a hospital or otherwise may not have the full-fledged facilities of evaluation/training in number of trades. In such units, it is often deduced that the applicability of a highly sophisticated, scientifically based structured and assembled series of work samples would be far beyond the scope of present work evaluation settings. However, a two-fold approach of setting up an evaluation unit with select-structured, standardized intensive work samples administered by a psychologist on one hand and the utilization of a series of trade related work samples on the other to be prepared and administered by the work evaluators would assist the rehabilitation personnel to come to a realistic vocational plan of the person leading to effective placement in the world of work.

The standard and structurized work samples to be administered by a psychologist would be dealing with the assessment of a person's capacities from the view point of employability, endurance, perseverance, inclination towards technical tasks, ability to go to higher levels of a particular job etc. and also the aptitude/suitability for various trades which may already be present in the Unit or in other organization attached with it. The technical personnel would prepare the work samples in a trade by selecting a few important, fundamental exercises, which could assist the evaluator to measure the person's capacity/ability to take up a particular trade.

TENTATIVE WORK SAMPLE :

The entry of a person in a trade marks the beginning of an evaluation period, which may spread over a few days. The initial stage of the evaluation period consists of introductory classes and familiarization of the person with the basic tools and equipments followed by a short assessment so as to know the person's ability to comprehend the instructions, their retention, understanding the usage of tools and other work traits like regularity, initiative, attention, concentration, speed and accuracy etc.

The above stage can be followed by the administration of a work sample that has been evolved directly from the vocational activity of the trade. In case of Watch repairing, the work sample could be the dismantling of a timepiece and then reassembling. It could be taken up as two phases of a particular activity. This work sample gives the measure of a person's ability to deal with a series of tasks leading to dismantling the timepiece and then reassembling it. And also his/her inclination towards technical/mechanical work and the potential to understand the use of small hand tools like screwdriver, pliers, tweezers etc.

Similarly a work sample may include wire joining, soldering, testing the continuity of a circuit, resistance, diode etc. which are the basic requirements in the fault finding, repair and servicing of a radio/television set. Another may include cutting and filing of a metal piece, drilling and thread cutting therein.

These tentative work samples thus provide at the basic stage, a picture of the person's ability to enter into various occupations, which necessitates the usage of simple tools, involves the identification of different parts, remembering and recalling their appropriate place and also his/her potential in the specific field. The success rate on a work sample is directly correlated to the success rate on actual work. The use of work sample bypasses the phobia/nervousness within a person, which he/she may have while put to work directly on actual equipments/exercises and helps develop self-confidence within the individual that is a significantly essential part of success rate in actual work situations.

YOUNG MINDS SPEAK - A STUDY ON ATTITUDE OF SCHOOL CHILDREN ON GENDER INEQUALITY & VIOLENCE AGAINST WOMEN

Sukanya Gupta

Swayam conceptualised and conducted the study 'Young Minds Speak' to investigate and bring into focus the issues of gender inequality and domestic violence from the perspective of adolescent children. Given that schools are microcosm of society at large, and that adolescents, soon to be adults, will shape the world of tomorrow, we believed that such a study would throw light into a subject that needs to be seen through the viewpoint of children.

Through our own experience of working with children of survivors of domestic violence and conducting workshops on gender inequality and gender based violence with school students, we came to hear of innumerable first hand accounts of gender discrimination in the family. We also realised that there was widespread acceptance of gender stereotypes and violence against women and girls amongst the students, but there was a great difference in the understanding of gender roles between boys and girls. We felt the need to systematically understand the attitudes of both girls and boys towards gender equality and violence against women and girls, with a special focus on domestic violence, as we found that there was a growing gap in the expectations they had from their relationships with one another.

Thus this study was conceived with the objective of :

- Assessing school children's attitudes to and experience of inequality between men and women.
- Assessing school children's attitudes to and experience of violence against women and girls and domestic violence in particular.
- Exploring the belief structure that encourages gender inequality and justifies gender based violence.

The study was conducted among school children between the ages of 12 to 19 years. The children directly interviewed were selected from English medium and Vernacular medium schools in Kolkata. A total of 3237 children were contacted across 19 schools. The schools selected were single sex as well as coeducational.

METHODOLOGY :

The approach in this problem-oriented study is a combination of inductive and deductive reasoning. Content and statistical analyses have been adopted. This is a short-term reconnaissance study that seeks to be descriptive, explanatory and seeks to advocate remedial steps. A research strategy best suited to the complexity of real life must combine a selection of methods. This study adopts qualitative and quantitative strategies of participant observation; semi-structured interviews; sample survey and statistical data.

Techniques used for data collection include sample survey, observation/listening to information through semi structured/structured group discussions and open interviews. Tools employed are questionnaires, field notes, diaries and random sampling.

The questionnaire comprised 18 structured questions and 1 open-ended sub question. Of the 18 structured questions, one question was divided into two parts, part 'a' to be answered by girls and part 'b' to be answered by boys. In total there were 20 questions.

The questionnaire was divided into three sections.

1. Demographic profile.
2. School children's attitude to and experience of inequality between the sexes.
3. School children's attitude to and experience of violence women and domestic violence in particular.

The questions were presented in a scrambled sequence in order to prevent any chance of influencing the school children by 'leading them'.

PROFILE OF STUDENTS :

A total of 19 school and 3237 students from Kolkata, West Bengal participated in this study, which was conducted towards the end of 2002. Of these 3237 students 1514 were female (47%) and 1723 were male (53%).

The majority of the participants, 55% were in the 14-16 years age group. The 17-19 years were the second largest age group and comprised 28% while the 12-13 years comprised only 17% of the total participants.

Of these 1627 were drawn from Vernacular schools, 1610 from English medium schools. 2566 attended single sex schools and 671 went to coeducation schools.

FINDINGS OF THE SURVEY :

The research findings reveal that school going adolescents are ambiguous on many issues. We have received mixed signals from them. On the one hand, there are encouraging signs of acceptance of equality among the sexes. On the other, a sizeable section prescribes to archaic views on the roles of women in society, and accepts violence as a legitimate means of resolving conflict under certain circumstances.

We also found marked differences in the attitude of girls and boys. In general, girls are more aware and have a better understanding of gender inequality and domestic violence as compared to boys.

No appreciable differences were found when comparing children in co-educational and same-sex schools. However there were marked differences between children from English medium schools and Vernacular schools on various counts.

Our age analysis revealed that more school children in the younger age groups tend to prescribe to gender stereotypes. Understanding about gender stereotypes and awareness of violence against women improves significantly with age.

Questions in section section 2 i.e. School children's attitude to and experience of inequality between men and women' were designed to elicit information about the target group's understanding, acceptance as well as experience of inequality between men and women in different areas. The key findings of this section are enlisted below :

- Overwhelming percentage of students in English medium schools believe that both girls and boys should have equal opportunities to study, have a career and enjoy their spare time.
- Majority of students from Vernacular medium schools agree that boys and girls should have equal opportunity to study, but only 50% feel that women should have a career of their choice and even fewer feel that women should have equal opportunity to enjoy their spare time.
- Majority of students (80%) feel that there should be no difference in treatment between girls and boys.
- Only 18% of all school children believe that they have been treated differently because of their sex. One in five girls have faced negative gender based differential treatment.
- More girls have reported experiencing adverse gender based differential treatment. For girls the negative treatment would include restriction with regard to life choices, behaviour, freedom of movement etc., while boys reported preferential treatment in most cases.
- Both young men and women accept many of the stereotypical images of women and men.
- Students from English medium schools prescribe more to the stereotypes of men being more aggressive and stronger than women, however more students from Vernacular schools prescribe to the view that men are intellectually superior to women.
- More boys believe that women are not equal to them and that they are more intelligent than women. Girls strongly disagree with this view.
- More students from English medium schools felt that men and women should share housework and household expenses, and were more accepting of a women going out to work and a man staying home to look after the family as compared to students from Vernacular medium schools.
- There is a wide difference in perception between girls and boys regarding gender roles.
- Girls are less likely to prescribe to gender stereotypes.
- The youngest age group is less aware of gender based differential treatment.
- Age analysis corroborates the sharp contrasts among the sexes but reveals great similarity of opinion among the different age groups of the sexes.

- The two older groups are more similar in their views than the youngest age group.
- As girls move from the early teens to adulthood, their perceptions change more than that of boys.

The key Findings of section 3. i.e. 'School children's attitudes to and experience of violence against women and domestic violence in particular' are enumerated below :

- The majority of students feel that violence against women is not acceptable, while about 36% feel that under certain conditions violence by men can be condoned.
- The form of acceptance of violence among girls and boys is different. Boys openly accept violence as a tool for resolving conflict in an intimate relationship. Girls exhibit a tacit acceptance of violence by their admission that they are more likely to forgive an abusive husband.
- Only 13% of the girls would report an abusive husband to the police.
- 32% of both girls and boys agree that it is acceptable to hit a sister, but 18% and 10% respectively think that it is acceptable to hit a wife.
- Acceptance of violence declines significantly with age.
- There is widespread awareness of the varied forms of domestic violence although young girls were more aware.
- Despite the widespread awareness of the different forms of domestic violence understanding is ambiguous. For instance, while only 45% of the students from English medium schools identified verbal abuse as a form of domestic violence this same group shows remarkable understanding with nearly 70% recognizing that denying a woman access to money is also a form of domestic violence.
- Students from Vernacular medium schools are more open to accepting physical violence against a woman than students from English medium schools.
- It is significant that boys from English medium schools are less accepting of violence against a woman than girls of Vernacular schools. In fact, girls from Vernacular schools are 4 times more accepting of violence than girls from English medium schools.
- 3 in 5 students think that domestic violence should not to be hidden behind closed doors.
- The younger age groups are more open to a public discussion on domestic violence as compared to the older two groups.
- 1 in 3 students 'know' someone who has faced domestic violence.
- Older students are more aware of domestic violence.

RECOMMENDATIONS :

We have seen from the findings of this study that many young people of today subscribe to stereotypical roles and values for men and women, which result in gender inequality. Our findings show that more boys than girls subscribe to stereotypical roles and values. As a result, there is bound to be an increase in conflict when these young people enter into relationships, as their expectations from each other are very different.

We should therefore like to make a few recommendations on how schools can help in ensuring that students learn to imbibe values of equality and non-violence so that we can look forward to a world where women are safe and free to exercise their human rights.

- ***School Policy against Violence*** – Schools could adopt an unambiguous policy of 'There is no Excuse for Violence' in their daily work, from punishment to interpretation of texts. Schools have to lead the way and show students non-violent ways of resolving conflicts.
- ***School Policy against Stereotyping*** – It has been seen that schools often tend to provide course options that steer girls towards stereotypical humanities, social sciences and home sciences, and boys towards the pure sciences. Many girls are conditioned to believe that mathematics and technology are the domain of boys, and tend to think that they are unable to cope with such subjects. Schools should encourage more girls to opt for 'technical' courses and sciences streams rather than the stereotypical option of humanities, creative arts and social sciences. The same applies to vocational activities and extra-curricular activities.
- ***Orienting Teachers*** – Teachers are a major influencing factor in the lives of students. Teachers are very often the role models for young students who admire them and emulate them silently. Therefore, it is important that teachers become aware of gender stereotypes that are ingrained in their thinking, so that they do not display any gender bias in their own interactions with young boys and girls. Moreover teachers can motivate the students to promote gender equality and fight gender based violence.
- ***Integrating gender perspective in school texts*** - School texts offer perspectives or reinforce norms that shape the way in which child's sense of ethics develops. Hence it is important to ensure that textbooks do not reinforce gender stereotypes that result in gender inequality.
- ***Working with parents*** - In the growing years, the home and school are the major influences in a child's life. Hence it is important that parents also challenge their own views on gender inequality and violence. Schools can play a significant role in sensitising parents to these issues by organising seminars, plays, debates etc.
- ***Awareness for students*** – In order to change perceptions of school children, so that they shed stereotypical notions of gendered roles and learn non-violent ways to deal with conflict, it is important for schools to organise group discussions and workshops on gender inequality and violence against women and the girl child.

All these will go a long way in ensuring that students look into themselves, challenge their own biases and views and work towards more healthy, equal and non-violent relationships.

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও তার প্রয়োগ দরকার সর্বস্তরে ঃ বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী *

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে একটি জরুরি বিষয় হওয়া উচিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যেমন খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়, তেমনই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার বিষয়টিতেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও তার প্রয়োগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা সর্বস্তরে দরকার। খুবই দুঃখের বিষয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে বেশি সেখানে এ বিষয়ে শিক্ষা এখনও পৌঁছতে পারেনি। এ বিষয়টি মাথায় রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমাদের এগোনো দরকার। ১১ জুলাই, ২০০৬ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের আয়োজনে 'জনসম্পদ শিক্ষা' বিষয়ক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের বিদ্যাসাগর কক্ষে দুদিন ধরে এই আলোচনা চলে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে।

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যা যে বিপদ এটা বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের জানা দরকার। যেমন জীবনশৈলী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তেমনই এইসব বিষয়গুলিও পাঠক্রমে আনতে হবে। তাঁর মতে, পুষ্টি এবং পণপ্রথা উচ্ছেদ দুটি বিষয় নিয়েই যথাযথ আলোচনা ও আন্দোলন হওয়া দরকার। বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জীবনচর্যায় পুষ্টি একটি অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত। পণপ্রথার বিরুদ্ধে এই স্তর থেকেই বিদ্রোহী মন গড়ে তুলতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের শিক্ষা উপসমিতির সভাপতি অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র এই সংস্থা জনসম্পদ শিক্ষাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছে তার প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা এবং তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা অন্যান্য প্রচলিত বহু বিষয়ের মতো এখনও সক্রিয় নয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা প্রভৃতির মতো বিষয়গুলিকে সমাজশৈলী এবং সামাজিক আচারের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। মানুষের আয় কম তাই পুষ্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অর্থ না থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এসব যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই প্রথমে দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। বিষয়টি বোঝার জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রয়োজন। ভীষণ জরুরি সামাজিক শিক্ষারও। এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে ছেলে হলে শাঁখ বাজানো হয়, দুঃখ প্রকাশ করা হয় মেয়ে জন্মালে। এসবকে তোয়াক্কা না করে কিভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব সেটা বুঝতে হবে। জানা দরকার, জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি, আচরণ ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে। যাঁরা এসব কাজ করছেন তাঁদের ধারণা থাকা দরকার এলাকা, রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে। বুঝতে হবে এক একটি জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কেও। তাঁর মতে, জীবনশৈলী শিক্ষা বা এইডস নিয়ে আলোচনা ও প্রচার যতটা গুরুত্ব পাচ্ছে জনসম্পদ শিক্ষার মতো বিষয়গুলি ততটা প্রচার পাচ্ছে না।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের রাজ্যস্তরের জনসংখ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পর্ষদ-এর সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, জনসম্পদকে কাজে লাগানো একটি জরুরি বিষয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি

---

* শিক্ষাদর্পণ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ঐ পত্রিকার সম্পাদকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত হল।

কোনো সমস্যা তৈরি করে না যদি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজের সুযোগ তৈরি হয়। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি দরকার। দরকার সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি। মানবিক অধিকার, আর্থিক সক্ষমতা, পুষ্টি, পণপ্রথার বিরোধিতা সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে চেতনার প্রশ্ন। জনসম্পদ শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টি ও পণপ্রথার মতো বিষয়গুলি সম্পর্কেও বিদ্যালয় স্তর থেকেই জানতে হবে। সামাজিক স্তরেও এসব বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। চাপ তৈরি করতে হবে প্রশাসনের ওপর। শুধু জনসম্পদ শিক্ষাই নয়, পাশাপাশি মূল্যবোধের শিক্ষা, আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাও জরুরি। তাঁর মতে, আজকের দর্শন হয়ে উঠেছে ভোগবাদ ও স্বার্থপরতা। ভোগ করার লোভ দেখানো হচ্ছে নানাভাবে। বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে হবে যে শুধু ভোগ করলেই চলবে না, তার সঙ্গে মূল্যবোধ শেখাও দরকার। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের পাঠক্রমেই মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়গুলি থাকা দরকার। গুরুত্ব দিতে হবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমকে। পড়াশুনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি ইতিবাচক মনোভাবের। ইদানিং আর একটি সমস্যা তৈরি হচ্ছে, কেরিয়ার-এর জন্য যা লাগে না সেখানে ছাত্র-ছাত্রী ঢুকতে চায় না। এই মনোভাব থেকে তাদের সরিয়ে আনতে হবে।

আলোচনা পর্বের নগরায়ণের ফলে সামাজিক অস্থিরতার সম্ভাবনা বিষয়ে বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা মহালয়া চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথমেই নগর, শহর ও গ্রামের পার্থক্যটি বিশ্লেষণ করেন। যা শহর নয়, সেগুলোই গ্রাম। গ্রাম থেকে নানা তাগিদে মানুষ শহরে আসছে। নগর তৈরি হচ্ছে। কিছু গ্রামাঞ্চল আবার চরিত্রগত বদলের জন্য শহরে পরিণত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যে কোনো ধরণের স্থানীয় প্রশাসন থাকলেই সেটা শহর, আবার কারও মতে, জনসংখ্যা, জনঘনত্ব, পুরুষ মানুষের কাজের চরিত্র (৭৫ ভাগ অন্তত অকৃষি কাজে যুক্ত) প্রভৃতির ওপর শহরের সংজ্ঞা নির্ভর করে। ২০০১ সালে জনগণনা অনুসারে, ভারতে মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ লোক শহরে বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৮ শতাংশ মানুষ শহরে থাকেন। কিন্তু নগরের অস্থিরতা শুধু জনসংখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না। জীবনযাপনের একটি বিশেষ পথ হল নগরায়ণ। তার নানা ধারা থেকে শুরু হয় সঙ্কট।

আলোচকের মতে একসময় পোশাক-আশাক, আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে শহুরে বা গ্রাম্য বলা হত। বিশ্বায়নের ফলে এখন আর এসব তেমন ধরা পড়ে না। গ্রাম থেকে যারা শহরে আসছেন তাদের মধ্যে চারিত্রিক বদল হলেও সঙ্কট তৈরি হচ্ছে। শহরের মধ্যেও একটা গ্রাম আছে। চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে জোগানও স্বাভাবিক হতে হবে। শহরে জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে পরিকাঠামোর উন্নতি দরকার। পানীয় জল, জলনিকাশি, আবাসন, পরিবহন, জঞ্জাল সরানো, বাজার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বাভাবিক থাকা দরকার। জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে পরিকাঠামোর উন্নতি না হলেই অস্থিরতা বাড়বে। চাপ আসবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। যে কোনো শহরে নানা ধর্ম ও ভাষার মানুষের অবস্থান, আর্থিক বৈষম্য—এসব থেকেও অস্থিরতা বাড়ছে। তিনি এসব প্রশমনে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠিত আন্দোলন এবং মূল্যবোধ জাগানোর পরামর্শ দেন। প্রশাসনিক শিথিলতাও এসবের জন্য দায়ী বলে মনে করেন আলোচক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায় বলেন 'জনবহুল দেশে ধারণযোগ্য বিকাশের সমস্যা' নিয়ে। তাঁর মতে, মানুষ পৃথিবীতে একটি নবাগত জীব। মানুষ প্রজাতির বয়স পৃথিবীর বয়সের তুলনায় ১/১০০০ শতাংশ। মানুষ কি বিপন্ন প্রজাতি ? নইলে ধারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? জনসংখ্যার নিরিখে বিচার করলে মানুষ বিপন্ন নয়। বিপন্ন বলতে তাদের বোঝায় যারা নির্দিষ্ট জনসংখ্যার নিচে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা এসবের ব্যবস্থা আছে কিনা ? পাশাপাশি

লক্ষ্য রাখতে হবে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর হারের দিকেও। এসবের ভিত্তিতেই প্রশ্ন উঠছে জনসম্পদ শিক্ষার। তাঁর মতে, আলোচনাটি ইকোলজির প্রেক্ষিতে হওয়া উচিত। শুধু মানুষের ওপর নয়। বিপদ আসছে জীবজন্তু, গাছপালা সবার ওপর। ইকো-সিস্টেম ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্বে যে বিপুল জিন ভাণ্ডার আছে তা রক্ষা করে এই ইকো-সিস্টেম। এমনকি এই সিস্টেমই বিশ্বের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইকো-সিস্টেমকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। বিপদ আসছে কৃষি-জমির ওপরও। তাই জনবহুল দেশে ধারণযোগ বিকাশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমগ্র আলোচনাটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি হওয়া উচিত।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গৌরীপদ দত্ত আলোচনা করেন 'পুষ্টি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য' বিষয়ে। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য বিন্যাস, রক্ষা ও পরিচর্যার দুটি অবিচ্ছিন্ন বিষয় পুষ্টি ও পরিবেশ। পৃথিবী তৈরি হয়েছে কয়েকশ' কোটি বছর আগে। মানুষের জন্ম মাত্র ৪০ লক্ষ বছর আগে। তাই জনসংখ্যা, জনসম্পদ এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবেশ এবং সামগ্রিক জীবমণ্ডল। তাই পুষ্টি ও স্বাস্থ্য আলোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি। তিনি স্বাস্থ্যচিন্তা, পুষ্টি এবং পরিবেশ-এই সম্পর্কটি সাবলীলভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কথায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান। স্বাস্থ্য কখনও সর্বজনীন হয় না। স্বাস্থ্যকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বও থাকতে হয়।

অধ্যাপক সৌমিত্র বসু 'বয়ঃসন্ধি ও মানসিক স্বাস্থ্য' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মানুষের বয়সের পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে তাল রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের বদল কোন পথে হচ্ছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক ক্ষেত্রের বদল অদ্ভুতভাবে ঘটতে থাকে।

১২ জুলাই আলোচনা পর্বের মূল বিষয় ছিল 'পাওলো ফ্রেইরের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা'। এ বিষয়ে বলেন ইণ্ডিয়ান পাওলো ফ্রেইরে ইন্সটিটিউট-এর (কলকাতা) অধিকর্তা ড. জলধর মল্লিক। তাঁর মতে, পাওলো ফ্রেইরে ছিলেন এমন একজন শিক্ষাবিদ যিনি আহরিত তত্ত্ব এবং জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হলো, শিক্ষা যেন নিপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষকে জোট বেঁধে মুক্তির সংগ্রামে শামিল হতে অনুপ্রাণিত করে। সচেতনতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। বিকশিত সচেতনতা ফ্রেইরের শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম স্তম্ভ। আলোচনাচক্রে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর অধিকর্তা ড. রথীন্দ্রনাথ দে। তাঁর মতে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা কীভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া যাবে এই আলোচনাচক্র থেকে। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক ও ধারাবাহিক শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ড. সনৎকুমার ঘোষ, ড. নির্মলকুমার দাশ প্রমুখ। প্রতিটি বক্তব্যের ওপর শ্রোতারা আলোচনায় অংশ নেন। প্রান্তিক পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

প্রসঙ্গত ১১ জুলাই, ২০০৬ রাজ্য শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের একটি নিজস্ব পোর্টাল উদ্বোধন করেন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি, 'এডুস্যাট' প্রকল্পের অন্তর্গত 'স্যাটেলাইট ইন্টারাকটিভ টার্মিনাল' সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। অধিকর্তা ড. দে জানান, এই পোর্টাল মারফৎ পরিষদের গত ২৫ বছরের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। জেলার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হবে এর মাধ্যমে। এতে থাকছে পরিষদের ধারাবাহিক কাজকর্ম, ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, বিভিন্ন সময়ের সরকারি আদেশনামা, প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রকাশনা সহ নানা সংশ্লিষ্ট তথ্য। ওয়েবসাইটের ঠিকানা w.w.w.scertwestbengal.org.

SCERT (WB) NEWSLETTER

Report of NPEP, SSA-DPEP and other activities of SCERT (WB) during 2006-07

A) National Population Education Project Activities

The National Population Education Project being funded by the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) began in West Bengal in early 1984 through the NCERT. The Project was being implemented as an educational Project for Human Resource Development from 1984 to 2002 in West Bengal at the Secondary and Higher Secondary stages. This programme acquired significance for attainment of better quality of life through School education.

The UNFPA funding for the project was stopped w.e.f. 31.12.2002 vide letter F.No. 5-3/02/DESSH/PEP/1230 dt. 07.10.2002. The Project was then taken up by NCERT vide F. No. 5-4/03/DESSH/PEP/2002 dated 23.01.2004, as a Centrally Sponsored Scheme titled "Quality Improvement in Schools". The major thrust areas of the Project in its reconceptualised form are:

a) Population and sustainable development
b) Gender equality and empowerment of women
c) Adolescence Education
d) Family: socio-cultural factors and quality of life
e) Health, Nutrition and Education: key determinants of population change
f) Population, urbanization and migration.

SCERT (WB) is the state level nodal agency for the implementation of this project. The project aims at inculcating values and developing different life skills in students so that they become responsible citizens of tomorrow. These objectives are to be achieved through organization of various cocurricular activities in schools of the state.

In 2006-07 many activities have been taken up at SCERT (WB), which may be enumerated as follows:

1. Meetings of the Advisory Board

A thirteen-member state level Advisory Board with Professor Ranju Gopal Mukherjee as President was set up by School Education Department, Govt. of West Bengal, in December 2004 to monitor the implementation of NPEP activities in the state. The Board meets from time to time to determine and approve the Plan of Action to be undertaken by SCERT (WB) in respect of NPEP. Two meetings of the Board have taken place this year on 26.07.2006 and 27.11.2006 in which important decisions were taken regarding the various aspects of the Project.

2. Development of Training Materials

The NCERT draft manual on Population Education for teachers based on the six themes of Population Education has been adapted to make it relevant for the state of West Bengal and has been translated in Bengali. The manual will be published soon.

3. Development, printing and circulation of Publicity Materials for Observing Population Education Awareness Programme, 2006

In an effort to disseminate the concepts of Population Education through cocurricular activities with special emphasis on the themes of the project, SCERT (WB) celebrated Population Education Week from 11-17 July 2005 in all the secondary schools and Madrasahs of West Bengal. This programme was carried out in collaboration with West Bengal Board of Secondary Education and West Bengal Board of Madrasah Education. For this purpose, booklets in Bengali and English were published by SCERT (WB) and distributed in all the educational institutions through the offices District Inspectors of Schools (Secondary). The Director of School Education, Govt. of West Bengal, issued necessary circulars to the DIs. A feedback form in the booklet was useful and indicated that many schools organized activities accordingly.

This year the duration of holding the activities in schools has been extended to three months, i.e. from 1st November 2006 to 31st January 2007. SCERT (WB) has published a booklet containing some guidelines including topics for different activities like debate, essay writing, poster drawing, group discussion, etc. based on the six themes of Population Education. Some topics under these themes are given below:

Theme	Activity	Topic
Population & Sustainable Development	Essay writing	1.Population and economic development 2.Population, development and agriculture
	Debate development	1. Industrialisation should be given priority for overall 2. Industry and agriculture are equally important for development
	Poster drawing	1.Industrialisation and water pollution 2. Limited services and population

Gender Equality & Empowerment of Women	Essay writing	1. Economic self-reliance is the main component of women's empowerment 2. Employment opportunities for women
	Debate	1. In the present society, women are treated as second class citizens 2. Educating women means educating the society
	Poster drawing	1. Dowry system 2. Greater participation of women in service sector
	Drama	1. Portion of 'Chandalika'- a dance drama by Rabindranath Tagore on untouchability 2. 'Rather Rashi' by Rabindranath Tagore
Adolescence Education	Group Discussion	1. Values and present society 2. Television and youth
	Debate	The youth of today is being led astray by unemployment
	Poster drawing	The different aspects of social environment- poverty, malnutrition, etc.
	Role play	The ill effects of smoking/ drug addiction
Family: socio-economic factors and quality of life	Essay writing	1. Joint family has no alternative in terms of social development 2. A healthy family is the basis of a healthy society
	Debate	1. The role of woman in the family is not given due recognition 2. The environment of small families is a deterrent to the all round development of a child

Health, Nutrition & Education – key determinants of population change	Poster drawing	1. Family is the safest refuge for a child 2. The manifestation of social values in the behaviour of adolescents
	Debate	1. The spread of mass education is basically responsible for development of public health 2. The role of cocurricular activities in the mental development of adolescents
Population, Urbanisation & Migration	Poster drawing	1. Fast food and injury to health 2. Poverty and social environment
	Essay writing	1. The problems of slum dwellers in urban areas and their solutions 2. Organised rural development can prevent unwanted migration
	Debate	1. Unplanned urbanization is a deterrent to social development 2. Inadequate rural development is the cause of economic crisis of our country
	Poster drawing	1. The unhygienic environment in slums and ways to improve it 2. Villages of West Bengal – past and present

These have been forwarded to all the DIs (secondary) of the state. All secondary schools and Madrasahs will observe "Population Education Awareness Programme - 2006" during the abovementioned period.

4. Documentation of activities

The activities under "Population Education Awareness Programme - 2006" will be carried out in all secondary schools and Madrasahs, but as per the approved Plan of Action, these will be recorded and documented specifically in 100 selected schools and Madrasahs of two districts, namely Nadia and Malda.

As a prelude to this, consultations were held at the DIETs of these two districts with Heads of Institutions and Resource Persons. To make the programme successful, the recognized teachers' organizations of the state were also involved.

5. **Observance of World Population Day**

A two-day seminar was organised on 11-12 July 2006 for observance of World Population Day. Eminent educationists delivered erudite lectures on the different themes of Population Education and students of nearby schools delighted the audience with their performance based on the themes.

A brief report of the deliberations of the seminar has been published in the September 2006 issue of SHIKSHADARPAN (a journal published by Govt. of West Bengal).

6. **Publication of Journal**

SCERT (WB) has initiated publication of a journal on Population Education under its NPEP activities. The journal, named 'Pratyay' would contain erudite write-ups (in English and Bengali) on different aspects of Population Education by eminent persons in the respective fields. The first issue was released on 4th October 2005 by Sri Kanti Biswas, the then Hon'ble MIC, School Education & Madrasah. The second issue has been published in March 2006. The journal is being circulated in all SCERTs in the country as well as in all state level organizations and DIETs in West Bengal.

The NPEP Newsletter of SCERT (WB) forms a part of the journal.

7. **Visits made for monitoring NPEP activities**

The President and other members of the Advisory Board of NPEP at SCERT (WB) visited the DIETs at Nadia and Malda in connection with the consultations for the planning and implementation of "Population Education Awareness Programme - 2006".

The Project Coordinator attended a workshop on content analysis of textbooks of classes I-XII in Adolescence Education points of view organised by NCERT that was held at Puri on 2-4 August 2006.

B) OTHER IMPORTANT ACTIVITIES OF SCERT (WB)

SCERT (WB) is a Post-graduate Research & Training organisation under the Department of School Education, Govt. of West Bengal, set up with the aim of carrying out training and research in different areas of school / teacher education. The major activities taken up at SCERT (WB) since April 2006 in this context are listed below:

1. **SSA-DPEP activities**

a) **Reaching the Schools** –

SCERT (WB) has taken up many projects under SSA-DPEP through which it envisages to reach as many schools as possible. This vision will be turned into a reality through the active participation of DIETs, CLRCs and CRCs. Such projects include

activity based Science teaching, activity based Mathematics teaching and development of content for e-learning in all school subjects.

- The draft manual on activity-based Science teaching titled **'Kajer Majhe Bigyan'** has been printed and consultations with school teachers have been held in seven DIETs in West Bengal between August and September. The draft manual is being finalised after incorporating the changes suggested at the consultations at the DIETs and also by the experts of the Core Group at SCERT.
- Consultations on the draft manual on activity-based Mathematics teaching developed by SCERT (WB) are being held. The activities will be tried out in schools before finalisation.

b) **<u>Survey and field work</u>** –

- A survey for assessing the impact of Mid Day Meal Scheme in the state of West Bengal would be conducted by the DIETs in their respective districts. A common format of questionnaire has been developed at SCERT (WB).
- A database on school education would be created with the help of the DIETs. The DIETs would work at the district level and findings would be collected at SCERT.
- Two different research studies had been taken up by SCERT (WB) in 2005-06 – the aim of one was to assess the challenges of SC/ST/minority children and of children with special needs in the district of Jalpaiguri, and the second survey aimed at assessment of availability of educational facilities to primary school children in Canning-I block of South 24 Parganas. The reports of these two projects are under preparation.
- Another survey was undertaken to make a study on 'out of School girls', 'girls with low attendance' and 'girls with low levels of achievements' at primary level in Sandeshkhali block of North 24 Parganas. The data collected are being processed.

c) **<u>Preparation of Manuals for teachers</u>** –

SCERT (WB) has taken up the task of preparing manuals on Inclusive Education, Early Childhood Care & Education (ECCE) and Action Research. These manuals would be in Bengali and will be used in future in-service orientation of teachers.

2. **<u>National Curriculum Framework 2005</u>**

In terms of Notifications no. 460-SE (Pry)/ SCERT-7/05, dated 14th July 2006 and No. 534-SE (Pry)/SCERT-7/2005, dated 23rd August 2006 of School Education Department, Govt. of West Bengal, a Core Group was formed for review of syllabi, textbooks and other related items relevant to the state, its concerned Boards/Councils based on National Curriculum Framework 2005 and recommendations made thereon and make appropriate recommendations.

The Director, SCERT (WB) is the convenor of the Core Group and Prof. Ranjugopal Mukerjee is its President.

The Core Group started its activities with the first Meeting held on 5th September 2006. Since then the Core Group has held four more meetings. As stated in the communication from NCERT, No. 7-3/2005-06/CG, dated 27th March 2006, the Core Group at SCERT (WB) has been entrusted with several responsibilities, some of which are:

1. Though a translated version of NCF'05 in Bengali was provided by NCERT, it was not satisfactory. So the Core Group is getting the NCF translated in Bengali afresh, which SCERT (WB) will publish and use. NCF (Bengali version) will be printed in adequate number and will be supplied to all DIETs, Circle Level Resource Centers, Cluster Resource Centres, CTEs, IASE, etc.
2. It will develop a time-bound programme for the review of syllabi and existing textbooks on the basis of recommendations made in NCF'05.
3. It will undertake review of teacher education programme.
4. The Core Group may also initiate processes to address issues requiring systemic reforms.

3. National Level Midterm Achievement Survey (MAS) 2006 at the end of class V

The National Level Midterm Achievement Survey 2006 (MAS'06) at the end of class V has been conducted by NCERT in collaboration with SCERT (WB), along with other SCERTs of India. The Director, SCERT (WB) was the state coordinator for conducting MAS'06 in West Bengal. In a meeting at NCERT on 12th and 13th December 2005 of the Directors of SCERTs with Prof. Avtar Singh (Project Coordinator) of DEME, NCERT, a plan of action was charted out which covered issues like tools for evaluation, selection of districts and schools for the tests, modalities of selecting sample students, administering the tests, etc. The entire process of sample selection was done by NCERT.

SCERT (WB) then translated the test materials on every subject in Bengali from the original document prepared by NCERT. The questionnaires for pupils and teachers were also translated. Translated set of the entire material had also been sent to SCERT, Tripura for their use. In the next phase, suitable officers from the DIETs were identified as District Coordinators in 10 districts of West Bengal (Coochbehar, Jalpaiguri, Malda, Dakshin Dinajpur, North 24 Parganas, Murshidabad, Nadia, Hooghly, Bankura and Bardhaman). The tests were administered in three subjects, viz. Language (Bengali/ Hindi), Mathematics and Environmental Science on more than 4000 students in West Bengal by the District Coordinators. This phase was completed within March 2006.

Finally, after the answer scripts from the districts (DIETs) were scrutinized by SCERT (WB) officials and a subject expert in Language, a brief status report on the performance of each of the selected districts was prepared by SCERT (WB) and sent to NCERT for further processing. The results of MAS'06 will be published by NCERT in due course.

4. **Implementation of Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education (CSSTE)**

The Perspective Plan of Teacher Education for CSSTE prepared by SCERT (WB) for the Tenth Five Year Plan was sanctioned by MHRD. The funds have arrived for DIETs, CTEs, IASE and SCERT. Under the scheme SCERT (WB) proposes to set up a Computer Cell and an English Language Cell with the funds sanctioned under CSSTE by MHRD.

It is envisaged that the practicing school teachers at the secondary level would be enabled to develop usewares on the subject contents as per the prescribed syllabi and apply them during teaching of the subjects. The teachers would be provided the training to develop the useware at the Computer Cell to be set up at SCERT (WB), which will function as a state resource center. The Computer Cell is proposed to be set up with the technical support of Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), Kolkata.

The English Language Cell would develop Multimedia Teaching Learning Material (MTLM) for teachers and students of English as second language. The MTLMs would focus on the development of Listening, Speaking, Reading and Writing skills. The Cell will also act as a resource center for English teachers and DIET lecturers.

A team from NCTE visited West Bengal on 6-9 June 2006 for Mid-term appraisal of CSSTE and visited several CTEs and DIETs along with the IASE and SCERT. The School Education Department nominated the Director, SCERT (WB) as the State Nodal Officer for conducting the Mid-term Appraisal and to provide essential support to the visiting team from NCTE.

5.a) **Operationalisation of Satellite Interactive Terminal (SIT) under EDUSAT Project**

A Satellite Interactive Terminal (SIT) installed by ISRO at SCERT (WB) under EDUSAT project is now fully operational. The system now provides two-way video and two-way audio connectivity through the EDUSAT, which enables SCERT to link up with NCERT, ISRO and other SCERTs in the country. In a teleconferencing programme organised by NCERT on 6th September 2006, selected participants from West Bengal took part in a national level consultation on "Capacity building of CRC coordinators on monitoring formats for quality dimensions under SSA". The formats have been developed by NCERT.

5.b) Interactive website (PORTAL) of SCERT (WB) [www.scertwestbengal.org]

On 11th July 2006 the official website of SCERT (WB), www.scertwestbengal.org was launched by Prof. Partha Dey, Hon'ble MIC, School Education, Govt. of West Bengal. The website provides a picture of the history of the organization, its roles and functions, the activities taking place, publications, events and training of SCERT (WB). Many important publications of SCERT (WB) can be downloaded from this site. This also provides a platform to obtain public opinion on any issue of school education by putting up an interactive page called FORUM. The PORTAL takes a visitor to the DIETs in West Bengal.

6. Study on SLIP+

School-based Learning Improvement Programme is a UNICEF funded project being run in 1000 primary schools and 558 SSKs in 8 blocks of 4 districts of West Bengal. SCERT (WB) has been entrusted with the task of carrying out a study of the efficacies of following components of SLIP+ activities:

- Reading Guarantee Programme
- Group Work
- Community Involvement in School Monitoring & Supervision

The study will be carried out in 100 schools in 3 districts, namely, Purulia, Jalpaiguri and Murshidabad. A research advisory group for this study has been formed and appropriate research design is being formulated.

7. Working at the national and state levels

SCERT (WB) has maintained a constant and dynamic relationship with national level organizations like NCERT, MHRD, NIEPA, RIE, IGNOU, etc. The Director, SCERT (WB) is a member of the National Committee for merger of SSA and Teacher Education Programme.

The Director and the Research Fellows of SCERT (WB) participated in several meetings and workshops and presented papers. The Research Fellows attended several training programmes organized by the above mentioned organizations.

At the state level SCERT (WB) is in continuous touch with organizations like West Bengal Board of Secondary Education, West Bengal Board of Primary Education, West Bengal Board of Madrasah Education, West Bengal Council of Higher Secondary Education, Rabindra Mukta Vidyalaya, Paschim Banga Rajya Shishu Shiksha Mission, UNICEF, etc. SCERT (WB) is involved in many of the activities of these organizations and provides academic support to them.

8. Research Methodology Course

A course on Research Methodology was organized at SCERT (WB) in collaboration with NCERT, New Delhi for capacity building of DIET and SCERT faculties from 13th to 24th November, 2006 at SCERT (WB) premises. The primary aim of the programme was to orient the DIET and SCERT faculty in basic elements of educational research and consequently help them in developing a research proposal in their respective fields. An important component of the course was the use of computers in educational research and hands-on experiences on computers by the participants.

9. Publications

SCERT (WB) published a number of reports of SSA-DPEP activities carried out in 2005-06. These are listed below:

1. Report of the project **'Celebration of International Year of Physics'**
2. Report of the project **'Tracking mainstream students admitted in Government and Government sponsored schools of West Bengal through the system of lottery in 1995'.**
3. A draft manual titled **"Kajer Majhe Bigyan"** containing examples of hands-on activities in Physical Science, Life Science and Geography for classes VI to VIII.
4. A book titled **"Twenty five Years of Research in School Education: The Scenario in West Bengal"**. It contains more than 150 titles of Ph.D. studies on school education in the departments of Sociology, Psychology and Education of universities of West Bengal since 1980. The abstracts of some theses have also been incorporated from 3rd, 4th and 5th Surveys of Research in Education published by NCERT with permission .
5. A book titled **"Reaching the Community through Radio – Teaching-learning of English as Second Language"**. It contains reports of workshops held to develop radio scripts and also the scripts which were broadcast by AIR, Kolkata and Siliguri in 21 episodes from 6th February to 21st March 2006.

COMMENTS
ON
PRATYAY

Phone : 2464-3551

LAKE SCHOOL FOR GIRLS

Recognised by :
West Bengal Board of Secondary Education (Index No. : A3-152)
and West Bengal Council of H.S. Education. (Index No. : 01139)
P-502, C.I.T. SCHEME NO. XLVII, KOLKATA - 700 029

Ref. No............................ Date : 06.09.2006

From

Dr. Sukla Sanyal
Headmistress
Lake School for Girls

To

Dr. Rathindranath De
Director
SCERT, West Bengal
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700 019

Sir,

I have received the copy of PRATYAY. I feel myself flattered by your presentation. The quality of the Journal is good and the presentation is excellent. The contents of the Journal is very timely with respect to the present scenario of Socio-economic Society. The Newsletter section of the Journal is extremely necessary.

I wish every success of the Journal.

With regrads,

Yours Sincerely,
SUKLA SANYAL
Sukla Sanyal 6/9/06
Headmistress
Lake School for Girls

MODERN HIGH SCHOOL FOR GIRLS
78, SYED AMIR ALI AVENUE
KOLKATA-700 019

Phone No. : 2287-5326/6080
Fax : 2281-6873 e-mail<mhscal1@vsnl.net>
Website : mhsforgirls.com

August 11, 2006

Dr. Rathindranath De
Director, SCERT (WB)
25/3 Ballygunge Circular Road
Kolkata 700 019

Dear Dr. De,

This is to acknowledge receipt of two issues of 'Pratyay' and the Teachers' handbook for life-style education.

The material will be extremely helpful in our understanding concepts such as "life-skills" and "life-style" as well as the pros and cons of teaching sex education in school.

Thank you for your kind gesture,

With regards,

Yours sincerely,

D. Kar

Devi Kar
PRINCIPAL

JOYRAMBATI RAMKRISHNA-SARADA PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE

Estd. – 2004

P.O.- Joyrambati, P.S.- Kotalpur, Dist.- Bankura

Ref. No. : 66 Dated : 30-6-2006

FROM-SECRETARY/PRINCIPAL/PRESIDENT

To

The Director,

State Council of Educational Research & Training, West Bengal

25/3, B.C. Road, Calcutta - 700 019

Sir,

I am very glad to receive the copy of the 2nd issue (2005-06) of SCERT 'S Journal on Population Education "Pratyay" sent by you by post.

I offer my thanks for your cooperation

Yours faithfully,

Chattopadhyay
28/6/06

Lecturer-In-Charge

Joyrambati Ramkrishna Sarada P.T.T.I

Joyrambati, Bankura

Government of West Bengal

Office of the Principal, Govt. College of Education,

Kazirhat, P.O.- Lakurdi, Dist.- Burdwan

Phone No. 0342-2656853

Memo No. : 84

Dated Burdwan, the 23rd June, 2006

From : The Officer-In-Charge, Govt. College of Education, Burdwan
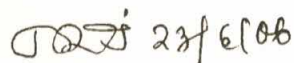
To : The Director, S.C.E.R.T., West Bengal

Sir,

Gratefully I acknowledge the receipt of your letter No. 371/11/PEP dated 8/6/06 along with 2nd issue of S.C.E.R.T'S Journal entitled 'Pratyaya'. Similarly I will be very much happy if you send us such copies of journal rich in educational ideas and thoughts in future.

Tanking You,

Yours faithfully,

[signature] 23/6/06

Officer-In-Charge

Govt. College of Education,

Burdwan

SCHOOL OF WOMEN'S STUDIES
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

PHONE : (033) 2414-6531, FAX : 2414-6008
E-MAIL : sws@cal2.vsnl.net.in
swsju@rediffmail.com

Dr. Rathindranath De
Director
SCERT
West Bengal

May 24, 2006

Dear Dr. De,

We gratefully acknowledge the receipt of following issue for our library :

- Pratyay (2005-2006)

The above journal would indeed be a valuable addition to our library collection.

Thank you.

Yours sincerly,

Samita Sen
Director

Loreto Day School Sealdah

122, Acharya Jagadish Chandra Bose Road

KOLKATA - 700 014

PHONE NO.: 2246-3845 / 2227-0220

FAX NO.: 033 2227-0228 / 2246-7722

smcyril@yahoo.com

Website : www.loretosealdah.com

24th May 2006

Mr. Rathindranath De
Director
SCERT, West Bengal
25/3, Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700 019

Dear Mr. De,

Many thanks for your second issue (2005-2006) of SCERTs Journal on Population Education 'Pratyay' which I found of great interest.

Thanking you and with warmest regards and prayers,

Yours in JC.

S. M. Cyril

Principal

Phone : 03482-271786

NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE

RECOGNISED BY : WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
& APPROVED BY GOVT. OF WEST BENGAL
Recognition No. 703/BPE/2005 Dt. 01-7-2006
Ransagar - P.O. + P.S. + Dist. : Murshidabad

Date : 06-05-06

Memo No. 58/ack/08

To

Sri Rathindra Nath De

Director

State Council of Educational Research & Training (W.B.)

25/3, Ballygunge Circular Road,

Kolkata - 700 019

Sir

I am glad to acknowledge receipt of your Journal "Pratyay" views will definitely be communicated in due time.

With regards

Yours faithfully,

6-5-06.

Lecturer-in-charge

Netaji Subhas Chandra Bose

Primary Teachers Training Institute

শিলিগুড়ি

৯ জুন, ২০০৬

প্রিয়বরেষু,

আপনাদের পাঠানো ‘প্রত্যয়’-এর দ্বিতীয় সংখ্যাও পেলাম। সরকারি যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবার পরেও যে আপনি আমাকে মনে রেখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

আমার মনে হয় **SCERT** -র মুখপাত্র হিসেবে ‘প্রত্যয়’-এ শিক্ষাগত **Policy & Problems** নিয়েই লেখা থাকা উচিত। কমলা দাসের কবিতা সম্বন্ধে শ্রী অমিত ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি এখানে **misfit**, এটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল কোনো **Literary Academic Journal** -এ। তাহলে লেখাটা যোগ্য পাঠকের নজরে পড়তো।

আপনি আমার প্রীতি নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানবেন।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.) [এস. সি. ই. আর. টি.] এর সঙ্গে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম ঃ

দূরভাষ - (০৩৩) ২৪৮৬-৪৩৭৭

- (০৩৩) ২৪৮৬-৫১১৪ (অধিকর্তা)

ফ্যাক্স - (০৩৩) ২৪৮৬-৫১১৪

পোর্টাল - w.w.w.scertwestbengal.org.

ই-মেল - edusearch253@yahoo.com